আপুনি'র ডায়েরি

আপুনি’র ডায়েরি

মূর্তালা রামাত

বৃক্ষ

আপুনি’র ডায়েরি
মূর্তালা রামাত

প্রকাশক
বৃক্ষ
১২/৪ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা
obaedakash@yahoo.co.in

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৮
একুশে বইমেলা ২০১২

স্বত্ব
শারমিন আকতার

প্রচ্ছদ
সঞ্জয় দে রিপন

দাম
১০০ টাকা

Apuni’r Diary a novel by Murtala Ramat
Published by Brikkha 12/4 Purana Paltan Lane Dhaka Bangladesh
Phone : 01731759473 email : obaedakash@yahoo.co.in
1st Edition Ekushe Boimela 2012
Price Tk. 100.00 $ 3

ISBN 984 70174 0011 6

উৎসর্গ

তিতলী ত্রপা

আমার সব কথা শোনার মতো কেউ নেই। তাই এই ডায়েরিকেই সব শোনাব আমি।

– অ্যানা ফ্রাঙ্ক

২২ এপ্রিল

ডায়েরি লিখতে হবে। ঠিক করে ফেলেছি। বাড়িতে আজকাল যা ঘটছে তার সব কিছু লিখে রাখা প্রয়োজন। কেন প্রয়োজন, জানি না। তবে মনে বলছে লিখে রাখ, লিখে রাখ। মেজদা বলেছে, মনের কথাকে মাটিতে ফেলতে নেই। এতে মন মাইন্ড করে। আর মন মাইন্ড করলে নিজের কোন না কোন ক্ষতি হয়। অতএব প্রতিদিন কিছু না কিছু আমাকে লিখতেই হবে। আজ সময় নেই, চোখ ভেঙ্গে ঘুম আসছে। কাল থেকে লিখবই লিখব। প্রমিজ।

২৩ এপ্রিল

বাড়িতে আজ মহা গণ্ডগোল। আব্বা সেই সকাল থেকে মা'র সাথে চেঁচামেচি করছে। তপুর স্কুলে নাম কাটা গেছে। তিন মাসের বেতন বাকি। ও আর স্কুলে যেতে চায় না। দুপুরে আব্বা ওকে আচ্ছা করে পিটিয়েছে। শুভ্রাকেও দুটো চড় লাগিয়েছে। সেই থেকে ও কাঁদছে। আমারও খুব কান্না পাচ্ছে। বিকেলে লিমনের সাথে দেখা করার কথা ছিল। হল না। কিচ্ছু ভাল লাগে না।

২৪ এপ্রিল

রাতে বৃষ্টি হয়েছে। জানালা খোলা ছিল। বেশ ঠাণ্ডা লেগেছে। বের হয়েছিলাম। লিমনের সাথে দেখা হয়নি। রাগ করেছে।

আব্বা আজ শান্ত। কারো সাথে কোন কথা বলছে না। মা খুব চিন্তায় আছে। তপু আজও স্কুলে যায়নি। ভাইয়ার চিঠি এসেছে– কেমন আছ, ভাল আছি টাইপের।

২৫ এপ্রিল

আব্বা আবার পাগলামি শুরু করেছে। একটা বাটি ছুড়ে মেরেছিল। অল্পের জন্য মা'র কপালে লাগেনি। আমি দরজা বন্ধ করে বসে আছি।

চাকরিটা যাবার পর থেকেই আব্বা কেমন যেন পাল্টে গেছে। মনে হচ্ছে হতাশা তাকে পেয়ে বসেছে। চাকরির মেয়াদ আরো দশ বছর ছিল। সরকার জোর করে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দিয়েছে। তার কথা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলাম, বিনিময়ে এই পেলাম! গলাধাক্কা! সারাদিন এই নিয়েই তার আক্ষেপ।

মা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। সে রাজি না। আলিম চাচা এসেছিলেন। আব্বাকে অনেক করে বোঝালেন। পেয়ারু মামাকে খবর দেয়া হয়েছে। সে আব্বার ছোটবেলার বন্ধু। উনি যদি কিছু করতে পারেন।

তপু কোথা থেকে যেন এক তোতাপাখি যোগাড় করে এনেছে। দেখতে অনেক সুন্দর। শুভ্রা সকাল থেকে পাখিটাকে রূপকথার গল্প শোনাচ্ছে।

আমাদের মানিপ্ল্যান্ট গাছটার পাতা কেমন হলুদ হয়ে যাচ্ছে। তপু বলেছে, আপা আমাদের টাকা কমে যাচ্ছেতো তাই এমন হচ্ছে। আমি টাকা কামালে দেখবি পাতা আবার সবুজ হয়ে গেছে।

আকাশে অনেক মেঘ। মনে হয় বৃষ্টি হবে। তোতার খাঁচার ওপর কাপড় দেয়া হল যাতে ওর ঠাণ্ডা না লাগে।

২৬ এপ্রিল

দিনটা ভালোই গেল। ভাবি অনিকে নিয়ে এসেছিল। ও একটু একটু কথা বলা শিখেছে। শুভ্রাকে বলে তুরবা। ভাইয়া নাকি শিঘ্রি দেশে আসবে, ভাবিকে চিঠি দিয়েছে। দুপুরে সবাই একসাথে খেলাম। আব্বা বেশ খোশ মেজাজে ছিল। পত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে এই সরকার বেশিদিন টিকবে না। নতুন সরকার এলেই পুরোনো সবাইকে চাকরিতে ফেরত নেয়া হবে।

মা'র সাথে ভাবির তেমন কোন কথাবার্তা হল না। মা খালি জিজ্ঞেস করেছিল, সজল ঠিকমত টাকাপয়সা পাঠাচ্ছে তো? ভাবির মুখ তাতেই কালো হয়ে গেছে। আমি মাকে পরে বলেছি, তোমার এসব কথা না বললে হয় না! মা কষে এক ধমক দিয়েছে, সংসারটা কীভাবে চলছে তুই জানিস?

আমার মন খারাপ দেখে তপু বলেছে তার টাকা হলে সে আমাকে এমন সব জিনিস কিনে দেবে যা দেখে আমি শুধু হাসব আর হাসব!

২৭ এপ্রিল

ভর্তি পরীক্ষা কাছিয়ে এসেছে। খুব টেনশন লাগছে। মেজদার কথা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স না পেলে জীবনই বৃথা।

কোচিং ক্লাসে লিমন আসেনি। অপু বলল ওর খুব জ্বর। অপুর হাতে ওকে চিঠি পাঠালাম। আল্লাহ ওকে তাড়াতাড়ি ভাল করে দাও, প্লিজ।

২৮ এপ্রিল

মেজদা চিঠি লিখেছে। সবার কাছে একটা করে চিঠি। শুভ্রা আমাকে ওর চিঠিটা দেখাল–

"শুভ্রামনি কেমন আছিস
এখনো কি ফুপিয়ে কাঁদিস!
নাকি একটু হাসিস টাসিস
আসছি ঈদে
দেখব এবার কেমন নাচিস"

আমাকে লিখেছে–

প্রিয় ছোটনি,

আদর নিস। কেমন আছিস? পড়ালেখা কেমন চলছে? ইউনিভার্সিটিতে চান্স কিন্তু পেতেই হবে। চান্স পেলে তোকে একটা পুরস্কার দেব বলে ঠিক করেছি। মস্ত প্রাইজ। এখনি বলব না। অপেক্ষায় থাক।

তপুর কী অবস্থা? লেখাপড়া ঠিকমত করেতো? ওকে দেখেশুনে রাখবি। মা এত টেনশন করে কেন? আমিতো আছি, তাই না?

আব্বাকে আমার কাছে চিঠি লিখতে বলিস। গ্রীষ্মের বন্ধে আসব ইনশাল্লাহ। ভাল থাকিস। আদর আদর আদর।

ইতি
মেজদা

তপুর চিঠি আমাকে দেখাল না। ও নাকি খেয়ে ফেলেছে! হা হা হা। আমার চিঠির ভাঁজে মেজদা পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছে, উপরে লেখা ইচ্ছামত খরচ করিস। ওটা দিয়ে তপুর স্কুলের বেতন দেব বলে ঠিক করেছি।

২৯ এপ্রিল

তোতাটা কথা বলতে শিখেছে। সকাল থেকে সে টপু টপু করে অস্থির। তপুর মতে এই তোতার মেধাশক্তি ওর মত প্রখর তাই কথা শিখতে দেরি হয়নি। শুনে আমি হেসে খুন। তপুকে বাজার করতে পাঠান হলে সে প্রায়ই কী কী আনতে হবে তা গুলিয়ে ফেলে। মাঝপথ থেকেই ফিরে এসে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা কুমড়া আনতে বলেছিলে না কাঁঠাল!

তপুর মেধাশক্তির নমুনা মনে করিয়ে দেয়ায় পর সে আমার উপর মহা খেপা খেপেছে। আমি নাকি ওর ভাল কিছু সহ্য করতে পারি না! আমি হিংসুটে!

ওদিকে শুভ্রা তোতার উপরে মহা খেপ্পা। তোতা কেন তার নাম বলছে না! সে যতোবারই বলে– শুভ্রা, তোতা বলে– টপু। শেষমেশ সে আমাকে বলেছে পচা পাখিটাকে ফেলে দিয়ে এসো, যাও।

৩০ এপ্রিল

আব্বা মেজাজ খারাপ করে বাইরে থেকে ফিরল। পেনশনের টাকা তুলতে গিয়ে শোনে এখন টাকা দেয়া যাবে না। যাচাই বাছাই, হিসেব নিকেশ এগুলোর পর তহবিলে টাকা আসলে পেনশন দেয়া হবে। ব্যাংকের করণিক মোখলেস মিয়া অবশ্য বলেছেন তাকে দশ পার্সেন্ট কমিশন দিলে সে সিস্টেমে এখুনি টাকাটা বের করে দিতে পারবে। আব্বা তাতে রাজি না। সারাদিনই এ নিয়ে তিনি রাগে গজগজ করলেন, হারামজাদারা পেয়েছেটা কী! পেনশন কি তোর দাদার টাকা! ঘুষ চাস শকুনের বাচ্চারা।

বিকেলে হঠাৎ করেই আব্বা চুপ মেরে গেল। মাকে ডেকে বলল, সজলের মা, আমাকে একটু শরবত খাওয়াতে পারবা? মা আমাকে তার কাছে বসিয়ে শরবত বানাতে গেল। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। তিনি অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার চোখে গভীর বিষাদ, অসহায়ত্ব। অমার কান্না চলে এল। আমি জানি পর্দার ফাঁক দিয়ে তপু, শুভ্রা আমাকে দেখছে।

কাঁদলে চলবে না। মেজদা একটা কথা বারবারই আওড়ায়, এ লং ওয়ে টু গো বিফোর স্লিপ...

৩ মে

দুদিন কিছু লিখিনি। ভাল লাগছিল না। আজও ভাল লাগছে না। তবু লিখছি। আজ একটা বিশেষ দিন। তপুর জন্মদিন। ওকে একটা বই গিফট করেছি "আমার বন্ধু জামিল"। জন্মদিন উপলক্ষে মা পায়েস রান্না করল। তপুর বন্ধুরা এবার কেউ আসেনি। তপু আসতে মানা করেছে। ওর মতে, বুড়োদের আবার জন্মদিন কী! অথচ ও কেবল ক্লাস এইটে পড়ে। আমি জানি ও কেন এমন করেছে। সংসারের অবস্থাটা ও বুঝতে শিখেছে। বাবার পেনশনের টাকা না পাওয়া গেলে বেঁচে থাকাই দায় হয়ে পড়বে। ভাবি থাকতে ভাইয়া মাসে মাসে টাকা পাঠাত। এখন আর পাঠায় না। মা অনেকবার তাকে সংসারের খবরাখবর জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। উত্তর নেই। শেষে ভাইয়া লিখেছে, টাকা লাগলে মলির কাছ থেকে নিয়ে নিও। ভাবির কাছে টাকা চাইতে মা'র লজ্জা লাগে, আমারও। ভাবছি লিমনকে বলব একটা টিউশনি খুঁজে দিতে।

৪ মে

হরতাল। কোচিং ক্লাসে যাওয়া হল না। লিমনকে দেখতে ইচ্ছা করছিল। উপায় নেই।

দেশের অবস্থা দিনদিন খারাপ হচ্ছে। প্রতিদিনই জ্বালাও, পোড়াও, ভাঙচুরের খবর আসছে। কলোনির দারোয়ান চাচাও সেদিন বলল, এই গবমেন্টের আয়ু শ্যাষ।

আব্বা অবাক রকমের চুপচাপ হয়ে গেছে। সারাদিন কোন কথাই বলে না। তাকে নিয়ে মা'র টেনশন আরো বেড়েছে। পেয়ারু মামার আজ আসার কথা ছিল। আসেনি। মা'র বিশ্বাস মামা আসলেই আব্বা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

শুভ্রা শেষ পর্যন্ত তোতাকে একটা শব্দ শেখাতে পেরেছে। সেটা হল পচা। তোতা শুভ্রাকে দেখলেই বলে পচা। শুভ্রা আজ মহাগম্ভীর গলায় আমাকে বলল, তোতাটা একটা বেয়াদব! তার বলার ভঙ্গিতে আমি বেশ মজা পেলাম।

৫ মে

পুলিশের গুলিতে বেশ ক'জন মারা গেছে। তাই আজও হরতাল। কলোনিতেও দেখলাম মিছিল হচ্ছে, জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো। হঠাৎ দেখি তপু সেখানে। মাকে ডেকে এনে দেখালাম। বিকেলে তপু বাসায় ফিরলে মা ইচ্ছামত বকলেন। আব্বা চুপ।

আজ জোছনা ছিল। আকাশে মস্ত বড় চাঁদ। আমার ঘরের জানালার পাশেই, মনে হয় হাত দিয়ে ধরা যাবে। সামনে পড়ার বই নিয়ে আমি অবাক হয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, আহ! কী সুন্দর! এমন সুন্দর জোছনা দেখেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, চাঁদের হাসি বাঁধ

ভেঙ্গেছে...। নিজের মনেই আমি গানটা গুনগুন গেয়ে উঠলাম। থামতেই দেখি আব্বা পেছনে। আমার মাথায় হাত দিয়ে তিনি বললেন, গানটা আরেকবার গাবি মা?

৬ মে

রাতে আব্বাকে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে দেখে খুব ভাল লেগেছিল। ছোটবেলা থেকে তাকে আমি এভাবেই দেখে আসছি। তিনি খেতে পছন্দ করেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত পাগলের মত শোনেন, মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলতে ভালোবাসেন, শরৎ-এর প্রতিটা উপন্যাস তার দুই তিনবার পড়া। ছেলেমেয়েদের তিনি অসম্ভব ভালোবাসেন। গায়ে হাত তোলা দূরে থাক সামান্য বকাটুকুও তিনি কখনো আমাদের দেননি। বরঞ্চ মা আমাদের বকলে তিনি তাকে উল্টো বলতেন, আহা বাচ্চা মানুষ, ওদের সাথে এমন করো না।

আমার মনে আছে মেজদা একবার তার পকেট থেকে টাকা চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছিল। আব্বা তাকে বলল, "লাগলে আমার কাছে চাইবি, চুরির দরকার নেই। কেন টাকা নিচ্ছিলি, বল?" মেজদা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, গল্পের বই কিনব। তারপর থেকে আব্বা প্রতিমাসে মেজদাকে তিনটা করে গল্পের বই কিনে দিত।

এসব অপচয়ে মা'র খুব বিরক্তি ছিল। আব্বা সেটা পাত্তাই দিত না। চিড়িয়াখানায় গিয়ে আমি বায়না ধরায় একবার তো আব্বা তিন দিনের জন্য এক হাতি ভাড়া করে আনলো! সেই হাতি পেয়ে আমি কী খুশি! আমার সেই আব্বা আজ কেমন যেন অন্যরকম! ভাবতেই কষ্ট হয়।

ঘুমের ভেতর মনে হয় অনেক কেঁদেছিলাম। কোচিং ক্লাসে আমার ফোলা ফোলা চোখ লিমন ঠিকই খেয়াল করল। কেন কেঁদেছি না বলা পর্যন্ত সে একটার পর একটা প্রশ্ন করতেই থাকল।

অনেকদিন পর লিমন আর আমি নদীর পাড়ে হেঁটে বেড়ালাম। নদীর ধার ধরে হাঁটতে আমার খুব ভাল লাগে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাড়ি খাবার শব্দ, বকের উড়ে যাওয়া, নৌকার গুলুইয়ে মাছরাঙার ঝিম মেরে বসে থাকা, উড়ন্ত চিলের ছো মেরে মাছ ধরা, শুশুকের হঠাৎ লাফ, বাতাসে কাশফুলের দোলাদুলি, ছেলেপেলের লাফঝাঁপ, খেয়াজাল দিয়ে জেলেদের মাছ ধরা, ডাহুকের ডুবসাঁতার, পাল তোলা নৌকার রাজহাঁসের মত যাওয়া আসা– সবকিছু আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি। মেজদা থাকতে আমরা হাঁটতে হাঁটতে প্রায়ই অনেক দূর চলে যেতাম। মেজদা অনেক মজার মজার গল্প জানত। একদিন সে আমাকে এই নদীটার জন্মের কাহিনী শুনিয়েছিল।

অনেককাল আগে এখানে ছিল ধূ ধূ প্রান্তর। পানির অভাবে এ অঞ্চলের লোকদের তখন মৃতপ্রায় অবস্থা। তারা স্রষ্টার কাছে পানির জন্য প্রার্থনা করল। স্রষ্টা তাদের ডাকে সাড়া দিলেন। পাঠালেন দুটো রাজহাঁস। স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে হাঁস দুটোকে খাওয়ানো হতো প্রচুর দুধ। তারপর এক পূর্ণিমায় দেখা গেল তারা নেই। তবে যাবার আগে দুটো ডিম তারা রেখে গেছে। এলাকার সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর চোখের জল ছিটাতেই সেই ডিম ফেটে চুরমার। বইতে লাগল দুধের নহর। কথিত আছে ভরা পূর্ণিমায় এই নদীর জল দুধ হয়ে যেত। সেই দুধ খেতে আসত ঝাঁক ঝাঁক রাজহাঁস। সে থেকেই এ নদীর নাম রাজেশ্বরী নদী। কালে কালে

লোকে স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়ায় নদীর জল আর দুধ হয় না, ক্রমে নদীও শুকিয়ে আসছে। লিমন এই গল্প শুনে হেসেছে। তার মতে এসবই লোকের বানানো কাহিনী।

নদীর তীরে হেঁটে মনটা আবার ভাল হয়ে গেল। বাসায় ফিরে তপু, শুভ্রার সাথে লুডু খেললাম। অনেকবার চুরি করেও তপু হারল। শর্ত অনুযায়ী আমরা দুজন মিলে আচ্ছামত ওর কান মলে দিলাম।

৭ মে

অবশেষে পেয়ারু মামা এসেছে। সাথে তার ছোট ছেলে কচা। কচা খুব মজার একটা ক্যারেক্টার। কথা বলতে গেলে একটার সাথে আরেকটা গুলিয়ে ফেলে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম– কিরে কচা কেমন আছিস?
সে বলল, আব্বায় বালা।
বললাম তোর আব্বা কেমন আছে?
সে বলে, আব্বায় আইছে তো!
আমি হেসেই বাঁচি না।

পেয়ারু মামাকে দেখে আব্বার মধ্যে আগের সেই আমুদে ভাব দেখা গেল না। কী পেয়ারা কী খবর বলে বরাবরের মত তাকে জড়িয়ে ধরলেন না! মাকে ডেকে মজা করে বললেনও না, "সজলের মা, পেয়ারু মিয়ারে পেয়ারা খাওয়াও।" পেয়ারু মামা নিজেও এতে চমকালেন। মাকে বললেন, ভাবি ঘটনাতো অন্যরুম লাগে!
মা ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কী রকম?

পেয়ারু মামা গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন, দোস্তাইরে মনে হয় বদ জিনে পাইছে!

পেয়ারু মামা আমাদেরও একই কথা বললেন, "অবস্তা ভালা না বুঝলা, চোক দেইখাই টের ফাইছি। বড়ই বদ জিন। আমাগো কামাইল্যারেও দরছিল। দোস্তাইয়ের লান হেও থম মাইরা বইয়া থাকত। একদিন দেহি চিক্কণ এক বাঁশের আগায় উইঠা নাচতাছে! হ্যাসে নিমতলীর পীর ছাহেবরে ডাকা হইল। পীর ছাহেব নৌকার তন বাড়িতে এক পাও ফালাইছে কী ফালায় নাই লগে লগে কামাইল্যা তার পাও দইরা কান্দন, হুজুর আমারে ছাইড়া দ্যান। কী আচারি বিছারি। হজুর কয় তাইলে ওই কলাগাছটারে উপড়াইয়া থুইয়া যা। হের পর কামাইল্যা ঠিক।"

পেয়ারু মামার গল্প শুনে আমরা সবাই ভয়ে অস্থির। রাতে দেখি তপু বালিশ কাথা নিয়ে আমার ঘরে এসে হাজির। তার নাকি একলা ঘুমাতে ভয় করছে! দোয়া দরুদ পড়ে ঘরের লাইট জ্বালিয়েই ঘুমালাম।

৮ মে

রাতে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দেখি প্রকাণ্ড এক সাপ আমাকে তাড়া করছে। আমি প্রাণপণে দৌড়াচ্ছি। সাপটা হঠাৎ মানুষ হয়ে গেল। আমার পাশে দাঁড়িয়ে সে বলল, এই পালাচ্ছ কেন? আমি তাকাতেই মানুষটার জিভ অক্টোপাস হয়ে আমার দিকে ছুটে আসল। আমি আবার দৌড় দিলাম। হঠাৎ দেখি নদীর ভেতর হাবুডুবু খাচ্ছি। একদল

রাজহাঁস আমাকে টেনে তোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। একসময় আমরা সবাই তলিয়ে গেলাম। গাঢ় অন্ধকার। তারপর দেখি আমার ডানা গজিয়েছে। অনেক অনেক রাজহাঁসের সাথে আমি উড়ে যাচ্ছি, নিচে মেজদা দৌড়াচ্ছে– থাম থাম। আর মনে নেই। সকালে মাকে স্বপ্নের কথা বললাম। মা বেশি করে আয়তাল কুরসি পড়তে বললেন।

দুপুরেই পেয়ারু মামা ছুটলেন। নিমতলীর পীর সাহেবকে নিয়ে আসবেন। কচা আমাদের এখানেই থাকল।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি দিন দিন উত্তপ্ত হচ্ছে। মিছিলের গর্জনে টেকা দায়। তপুর বাইরে যাওয়ার উপর মা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আমাকে বলা হয়েছে ওর উপর নজর রাখতে।

আব্বা আগের মতোই চুপচাপ। মতিন আঙ্কেল এসে প্রেসার চেক করে গেলেন। কিছু ওষুধপত্র দিলেন। বললেন হাইপার টেনশন কমাতে হবে।

ও তোতার কথাতো বলাই হয়নি। সে ভালই আছে। শুভ্রার ভাষায় খালি খায় আর ঘুমায়।

৯ মে

কোচিং থেকে মার্কেটে ঘুরতে গিয়েছিলাম। তমার সাথে। তমা বেশ কটা ড্রেস কিনল। আমার একটা পছন্দ হয়েছিল, দাম অনেক। তমার

বাবার গোডাউনের ব্যবসা। পয়সাওয়ালা পরিবার। আমাদের সাথে ওদের আকাশ পাতাল তফাত। তবুও কীভাবে যেন ওর সাথে আমার গাঢ় বন্ধুত্ব। ওর অনেক গোপন কথাই ও আমাকে বলেছে। সেগুলো এখানে লিখতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু লেখা উচিত হবে না। আমার এই লেখা অন্য কেউ পড়ে ফেললে ওর খুব সমস্যা হবে।

ঘোরাঘুরির পর বাসায় ফিরলাম। তমাই গাড়িতে করে পৌঁছে দিল। বাসায় ঢুকেই দেখি ফরহাদ ভাই। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সে সম্পর্কে আমার লতায়পাতায় কাজিন, বড় ভাইয়ার বন্ধুমানুষ। পেশায় ডাক্তার। লোকটাকে আমি দুই চোখে দেখতে পারি না। সে এ পর্যন্ত অনেকবার আকার ইঙ্গিতে তার পছন্দের কথা বলার চেষ্টা করেছে। আমি পাত্তা দেইনি। একবারতো বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে কড়া ধমক খেয়েছিল। এরপর অনেকদিন এ বাসায় আসেনি। আজ কেন এসেছে বুঝতে পারলাম না। মাকে জিজ্ঞেস করলাম। মা বলল তোর আব্বাকে দেখতে এসেছে। মা'র সাথে আমার বাকি কথোপকথনটা এমন–

কেন? আমি মুখ শক্ত করে বললাম।

বারে, আসলে দোষ কী! আত্মীয় আত্মীয়ের বাসায় আসবে না। বেচারার মা নেই, আমাকে মা'র মত দেখে।

না, আসবে না। তুমি জান না, আমি ওনাকে পছন্দ করি না।

তুই কেন যে এমন করিস, বুঝি না! ছেলেটা খারাপ কীসের। ডাক্তারি করছে, আয় রেজগার ভাল। তোকেও খুব পছন্দ করে। তোদের বেশ মানাবে।

দেখ মা, আর একবার এ ধরনের কথা বললে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। তুমি তাই চাও?

তাতো যাবিই, যা। আমার হয়েছে যত জ্বালা। সংসারতো আমাকেই চালাতে হচ্ছে। যোগাড়যন্ত্র কোথা থেকে হচ্ছে বুঝিস? এই দুঃসময়ে ফরহাদ না থাকলে কোথায় যেতাম আল্লাই জানে।
কী বলছ মা! তুমি ফরহাদ ভাইয়ের থেকে সাহায্য নিয়েছ? ভাইয়া, মেজদা শুনলে কী হবে ভেবেছ?
এখন ভাবাভাবির সময় না, বেঁচে থাকার সময়। তোর ভাই কি আমাদের কোন খোঁজ রাখে? আর অন্যজন নিজের লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত। থাক ওসব কথা, যা ফরহাদকে চা দিয়ে আয়।
পারব না, বলে আমি ঘরে চলে এলাম।
সেই থেকে ঘরেই আছি। মাঝখানে তপু এসে দরজা ধাক্কিয়েছিল, খুলিনি। আমার মেজাজ একবার খারাপ হলে ঠিক হতে সময় লাগে।

মেজদাকে চিঠি লিখতে হবে। কাগজ কলম নিয়ে সেই কখন থেকে বসে আছি, কিছুই লিখতে পারছি না! ধ্যাৎ!

১০ মে

কারো সাথেই সারাদিন কোন কথা বললাম না। শুভ্রা ছড়া শোনাতে এসেছিল। কষে এক ধমক দিলাম। পড়ালেখা করে না বলে তপুটাকেও বকলাম। কচা দেখলাম তপুকে বলছে, আফারে বদ জিনে ফাইছে! তাকেও দিলাম এক ধমক। বললাম কালকের মধ্যে এক থেকে বিশ পর্যন্ত মুখস্থ না বলতে পারলে ওর খবর করে ছাড়ব।

১১ মে

লিমনের সাথে দেখা হল। ওকে বেশ চিন্তিত দেখলাম। বলল, দেশের অবস্থা ভাল না। তাই ওর বাবা মা চাচ্ছেন ও যেন বিদেশে চলে যায়। তুমি কি ভাবছ, আমি জিজ্ঞেস করলাম? ও বলল বুঝতে পারছে না। সেই থেকে বুকের ভেতর একটা চাপা কষ্ট অনুভব করছি। কাঁদতে ইচ্ছা করছে।

ফেরার পথে ইচ্ছামত বৃষ্টিতে ভিজলাম। বাসায় এসে টের পেলাম শরীর গরম হয়ে আসছে। ছোটবেলায় জ্বর আসলে বেশ মজা লাগত। স্কুলে যেতে হবে না, পড়া করতে হবে না! এই খুশিতে তখন দোয়া করতাম জ্বর যেন বেশিদিন থাকে। এখন তেমন দোয়া করতে পারছি না। সামনে পরীক্ষা। এই সময় অসুখে পড়লে নিজেরই ক্ষতি।

১৭ মে

টানা জ্বরে ভুগলাম। আজ বেশ ভাল। এ কদিনে বাসায় অনেক কিছু ঘটেছে। সংক্ষেপে লিখছি।

আব্বার মেজাজ আবারও চড়েছিল। মেজদার অ্যাকুরিয়ামসহ বেশ কিছু জিনিসি এ যাত্রায় ভেঙ্গেছে।

পেনশনের টাকা কবে পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই।

দোকানদার চাচা বলেছে সে আর বাকিতে মাল দিতে পারবে না।

আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশের গুলিতে মারা গেছে আরো চারজন। আগামী সপ্তাহে লাগাতার অবরোধ ডাকা হয়েছে।

কলোনির বেশ কিছু ছেলেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। তপুর বাইরে যাওয়া একদম বন্ধ।

পেয়ারু মামা এখনো ফেরেনি। কচার এখানে থাকতে ভাল লাগছে না। সে বাড়ি যাবার জন্য কান্নাকাটি করেছে। তবে এ কদিনে সে বিশ পর্যন্ত মুখস্থ করতে পেরেছে।

শুভ্রা তোতাটার একটা ছবি এঁকে রং করেছে। ভারি সুন্দর হয়েছে।

জ্বরের ভেতর আমার খোঁজখবর করতে ফরহাদ ভাই এসেছিলেন। মা এতে খুব খুশি!

আমার অসুস্থতার খবর ভাবিকে জানানো হয়েছিল। অনিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সে আসার সময় পায়নি!

মুক্তার হাতে লিমন একটা চিঠি পাঠিয়েছে, "...কেমন আছ? তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ। বিশেষ কাজে আমাকে ঢাকায় যেতে হচ্ছে। তাড়াতাড়িই ফিরব। তখন তোমার সাথে দেখা হবে। ভাল থেক। শরীরের যত্ন নিও..."

মেজদার চিঠি এসেছে।

ছোটনি,

কেমন আছিস? আমার স্নেহ নিস। তোদের কথা খুব মনে পড়ে। মা কেমন আছেরে? সবাইকে দেখতে খুব ইচ্ছা করে। আজ ঘুম থেকে ওঠার পর মনে হল টিকিট কেটে বাসে উঠে পড়ি, তোদেরকে দেখে আসি। পারলাম না। জানিসইতো দেশের অবস্থা কেমন। এখন বাড়িতে যাবার সময় না। এখন রাজপথে থাকার সময়। আমরা কেউ ক্লাসে যাচ্ছি না। স্যারেরাও আমাদের সাথে আছেন। আমরা সবাই দেশের জন্য আজ একতাবদ্ধ। আমার খুব শিহরণ হচ্ছে। '৭১-এর কথা মনে পড়ছে। মনে আছে, আব্বা আমাদের নিয়ে গোল হয়ে বসে যুদ্ধের গল্প শোনাত? তার গল্প শুনে আমার খুব আফসোস হত। কেন যে '৭১-এর আগে জন্মাইনি! কেন যে আমি মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারিনি।

আমার সেই আফসোস মেটাবার সময় এসেছেরে বোন। তুই না দেখলে বিশ্বাস করবি না আমাদের মিছিলগুলোতে কত মানুষ হয়। যেন ফুঁসে ওঠা একটা মহাসাগর গর্জন করতে করতে যায়! মনে আছে একবার আমরা ঠিক করেছিলাম রাজেশ্বরী নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে সাগর দেখতে যাব। যাওয়া হয়নি। কিন্তু ভাগ্য আমাকে ঠিকই সাগরের কাছে নিয়ে এসেছে। তুই যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবি তখন হয়ত এই সাগর শান্ত হয়ে যাবে, তবে তার আগে ভেঙ্গেচুরে দুমড়ে মুচড়ে আমাদের দেশটাকে নতুন চেহারা দিয়ে যাবে। যে চেহারার স্বপ্ন দেখে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যুদ্ধে গিয়েছিল, সেই একই স্বপ্নে সওয়ার হয়ে তোর মেজদাও ছুটছে। তোর গর্ব হচ্ছে না?

আমি জানি, তুই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবিই। কখনো সাহস হারাবি না, স্বপ্ন ছাড়বি না। রুশো বলেছেন, মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। স্বপ্নই আমাকে এখানে এনেছে, আমাকে আরো বড় হবার সাহস যুগিয়েছে। আমি এখন আরো দূরে যেতে চাই।

ছোটনি আমার জন্য দোয়া করিস। ভাল থাকিস। ছুটিতে বাড়ি এলে দেখা হবে।

মার কাছে লেখা চিঠিতেও মেজদা আন্দোলনের কথা লিখেছে। চিঠি পাবার পর থেকেই মা অস্থির। মেজদাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে নিজে একটা চিঠি লিখেছেন, আমাকেও লিখতে বললেন।

আজকের আবহাওয়াটা বেশ চমৎকার। গরম অথচ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। তপু বলল, আপুনি চল ছাদে যাই। গেলাম। বাতাসে বৃষ্টির মিষ্টি একটা ঘ্রাণ। ইস! যদি পাখি হতাম। সারাদিন এই ঘ্রাণ নিতে নিতে উড়ে যেতে পারতাম।

১৮ মে

তেমন কিছুই লেখার নেই। কচা এসেছিল এক দুই তিন শোনাতে। দশ পর্যন্ত বলার পর সে শুরু করল, "এক দশ এক এগারো, এক দশ দুই বাবারো, এক দশ তিন তেবারো...!" শুনে আমার ভিরমি খাবার যোগাড়। বললাম একদশ দুই বাবারো নারে গাধা বল বারো। কচা আবারো বলে বাবারো! সারাদিন তাকে বারো তেরো শেখাতে শেখাতেই পার হল।

ভাবছি এর পর আর দিন ধরে ধরে লিখব না। যেদিন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটবে বা যেদিন লিখতে ইচ্ছে করবে সেদিনই শুধু লিখব।

১৯ মে

মেজাজ খুবই খারাপ। আমার ডায়েরিসহ তপুকে হাতেনাতে ধরেছি। তপু স্বীকার করেছে প্রায়ই সে লুকিয়ে লুকিয়ে আমার লেখা পড়ে। ওকে কষে দুটো থাপ্পড় লাগিয়েছি। মাকে নালিশ দিলাম। সে কোন গুরুত্বই দিল না। মেজাজ আরো খারাপ হল। পুরো ডায়রিটাই একবার ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিলাম। পরে ভাবলাম, থাক। তপুর মত তুচ্ছ একটা বদের জন্য আমার পরিশ্রমের লেখা নষ্ট করার কোন মানে হয় না। তার চেয়ে আমার ড্রয়ারের তালা পাল্টান ভাল।

২২ মে

মা'র কথামত ভাবির সাথে দেখা করতে যেতে হল। কিছু টাকা প্রয়োজন।

ভাবি আগে আমাদের সাথেই থাকত। পরে তার আবদারে ভাইয়া তাকে আলাদা বাসা করে দিয়েছে। ভাবির ভাষায় অনিকে নিয়ে থাকার জন্য আমাদের বাসাটা অনেক ছোট, আলো বাতাস কম। তার আত্মীয়স্বজন এসে থাকতে পারে না ইত্যাদি। আসল কারণ আমাদের কারো অজানা নয়। ভাবি কখনোই আমাদের সাথে মানাতে পারেনি। লোকমুখে শুনেছি আমাদের ফ্যামিলিতে এমন টানাটানি সে কল্পনাও

করেনি। আগে জানলে বড় ভাইয়াকে বিয়ে করা দূরে থাক তার সাথে পরিচিতই হত না। সে কারণেই ভাবি আলাদা থাকতে চেয়েছে। ভাইয়ারও এতে সায় ছিল। মা বলে, "পরের মেয়েকে দোষ দেয়া ঠিক না, আমার ছেলেই আমাদের পর ভাবে।"

মা'র কথা ফেলার মত নয়। ভাইয়া বরাবরই সংসার সম্পর্কে উদাসীন। পরিবারের সবার বড় হয়ে তার যে দায়িত্ব পালন করার কথা সেটা আমি তাকে কখনো করতে দেখিনি। ঘরের বাজারটা পর্যন্ত মেজদা করত। ছোট্ট একটা ঘটনা দিয়ে ভাইয়ার চরিত্র বোঝা যেতে পারে। একবার গ্রীষ্মের সময় আমরা গ্রামে যাব। ভাইয়াকে দেয়া হল টিকিট কাটার দায়িত্ব। যাওয়ার দিন দেখা গেল ভাইয়া সবার জন্য কেটেছে নর্মাল টিকিট শুধু নিজের জন্য এসি সিট!

তারপরও কেন জানি সবসময়ই সে আব্বা আম্মার কাছে আদর, বেশি গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। এ নিয়ে বলতে গেলেই মা সেই পুরনো গল্প শোনায়, "আমাদেরতো প্রথমে বাচ্চাকাচ্চাই হচ্ছিল না। তারপর সজল হল। আকাশের চাঁদ পেলাম। ওর আব্বা তিন মন মিষ্টি কিনে সারা গ্রাম খাওয়াল..."

আমাদের কারোরই জন্মের পর এতোটা উৎসব হয়নি। শুভ্রাতো কোন রকম দেখভাল ছাড়াই বেড়ে উঠল। আমি নিশ্চিত আব্বা ওর জন্মতারিখটা পর্যন্ত বলতে পারবে না।

আব্বা আম্মার প্রিয় সেই সজল বিদেশে গিয়ে বউকে আলাদা বাসা করে দিল। টাকাপয়সা সেখানেই পাঠায়, নামকাওয়াস্তে চিঠি লিখে

পরিবারের খোঁজপত্র নেয়। মা অবাক হতে হতে এখন আর হন না। ভাইয়ার কথা উঠলেই চোখের পানি আটকানোর চেষ্টা করেন।

ভাবি বাসায়ই ছিল, রেশমাও। রেশমা তার চাচাত বোন। রেশমার বড় বোনের ননদ এসেছে; তাদেরকে নিয়ে তারা মহা ব্যস্ত। গরুর মাংস, খাশির রেজালা, পোলাও, মুরগির রোস্ট, পাবদা মাছের ঝোল, আরো অনেক পদ রান্নার আয়োজন।

আমি তাকে রান্নায় সাহায্য করলাম, অনিকে গোছল দিয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়ালাম। ভাবির অনুরোধে তার দুটো জামা রিপু করলাম তারপর ছুটি মিলল; ভাবি কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "মাকে বল সজলের নিজের অবস্থাই ভাল না। আয় ইনকাম কমে গেছে। এ মাসে খুব কম টাকা পাঠিয়েছে। তাই এর বেশি দিতে পারলাম না।" বললাম, অসুবিধা নেই। আসার সময় শুনলাম ভাবি কাকে যেন বলছে, এত বড় সংসার কি একার টাকায় চলে বলেন। আপনাদের জামাই গাধার খাটুনি খাটছে তারপরও কুলাচ্ছে না।

সময় এলে ভাবিকে এর জবাব দিতে হবে ঠিক করে রাখলাম।

মাকে সব বলার পর মা বলল, কী আর করা, যা পাওয়া গেছে তাতেই আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ ওদের ভাল রাখুন।

ভাবি জোর করে কিছু খাবার দিয়ে দিয়েছিল। সেগুলোর আনার জন্য মার কাছে বকা খেলাম। ওগুলো আনতে আমারও ইচ্ছা করছিল না, খেতেও ইচ্ছা করছিল না, মোট কথা ও বাসায় প্রতিটা মুহূর্ত আমার

কাছে মনে হচ্ছিল আযাব। ভাল ভাল খাবারগুলো গলা দিয়ে নামছিল না। বারবার তপু, শুভ্রার মুখ মনে পড়ছিল। ওরা কতদিন এমন খাবার খায় না! ওদের জন্যই খাবার নিয়ে আসা।

২৪ মে

লিমনের কোন খোঁজ নেই। কবে ফিরবে কিছুই জানি না। রাসেল বলল, "দেখ আর ফেরে কীনা! ঢাকা থেকেই বিদেশ চলে যেতে পারে।" ওর কথা হেসে উড়িয়ে দিলেও বুকের ভেতর সেই থেকে চাপা একটা আশঙ্কা অনুভব করছি।

আচ্ছা ও কি আমাকে সত্যিই ভালোবাসে? বা আমি লিমনকে? চোখ বন্ধ করে অনেক্ষণ চিন্তা করলাম। টুকরো টুকরো অনেক ছবি ভেসে উঠল। লিমনের সাথে আমার পরিচয় বেশিদিনের না, দুবছর। জয়নাল স্যারের কাছে ইংরেজি পড়ার সময় আমাদের প্রথম দেখা হয়। আস্তে আস্তে পরিচিতি। ঘনিষ্ঠতা। অন্তরঙ্গতা। লিমনই প্রথম আমাকে পছন্দের কথা জানিয়েছিল। এক বিকেলে হঠাৎ সে বলল, যদি বলি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি, তুমি কি সেটা স্বাভাবিকভাবে নেবে?
উত্তর দিতে সময় লাগবে, আমি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিলাম।
সময় নাও, লিমন বলে।
সময় নিয়ে ভাবতে গিয়ে দেখি ভালোবাসার কথা চিন্তা করতেই লিমনের ছবি চোখে ভাসছে। একবার, দুইবার, অনেকবার। গত দুই বছরে সেটা আরো পোক্ত হয়েছে। লিমনকে ছাড়া কিছু চিন্তা করতে গেলেই ভেতর থেকে দলা পাকিয়ে কষ্ট ওঠে।
তোমারও কি এমন হয়? লিমনকে কদিন আগে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ও খানিক ভেবে বলল, দেখ আমি জাত ব্যবসায়ীর ছেলে। ব্যবসায়ীদের অনুভূতি কম হয়। যা হয় তা তারা চাপা দিয়ে রাখে। আমার অনুভূতিও সেরকম। এখনও ফিল করছি না, পরিস্থিতিতে পড়লে বলতে পারব।
ব্যবসায়ীরা লাভ ক্ষতি হিসেব না করে এক পাও ফেলে না, তুমিও তাহলে তাই?
পৃথিবীর এমন কেউ কি আছে যে নিজের লাভ ক্ষতি হিসেব করে না! বৃষ্টির দিনে পাগল পর্যন্ত গাছের নিচে দাঁড়ায়, লিমন গম্ভির হয়ে বলেছিল।

লিমনটা এমনই। এই হাসিখুশি এই গম্ভীর। তবে যা বলে মন থেকে বলে। এ জন্যই ওকে আমার এত পছন্দ। আচ্ছা ও যদি আর ফিরে না আসে তাহলে আমি কী করব?

মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ভাবতে ইচ্ছা করছে না। অন্য কিছু লিখি।

প্রচণ্ড গরম পড়েছে। গরমে টিকতে না পেরে তপু মাথা ন্যাড়া করে এসেছে। তার দেখাদেখি কচাও। তাই দেখে শুভ্রা বায়না ধরল সেও ন্যাড়া হবে। অগ্যতা তাকেও ন্যাড়া করে আনা হয়েছে। ওরা তিনজন মিলে এখন সুর করে তোতাটাকে শেখাচ্ছে "টাক বেল" । শুনতে খুব মজা লাগছে। স্কুলে সবাই টাক বেল বলে ক্ষেপাতো বলে ছোটবেলায় আমি মাথা টাক করতে চাইতাম না। মা জোর করে টাক করে দিত। আমার কান্না থামাতে আব্বা এনে দিত বেলুন। সুতা হাত থেকে ফসকালেই বেলুন উড়ে যেত আকাশে। আমি আবার কাঁদতাম।

সেই সময়গুলো লাল নীল বেলুনের মতই উড়ে গেছে। কখনো ফিরে পাওয়া যাবে না! আমার কান্না পাচ্ছে...।

২৬ মে

হরতাল অবরোধে দেশ অচল। কলোনির সামনের রাস্তাতেই পুলিশের সাথে জনতার মারামারি হল। বারান্দা থেকে রক্তারক্তির দৃশ্য দেখে খুব ভয় পেলাম। পুলিশ একপাশ থেকে গুলি, টিয়ার গ্যাস ছুড়ছে। অন্যপাশ থেকে মিছিলকারীরা ইট, পাথর মারছে। এর মধ্যেই দেখলাম রক্তাক্ত কয়েকজনকে পুলিশ পেটাতে পেটাতে গাড়িতে নিয়ে তুলল!

বিকেলেই খবর আসল কলোনির ছাত্রনেতা মইন ভাইসহ কয়েকজন নিখোঁজ। তপু খবর আনল ওর বন্ধু রহমানকেও পাওয়া যাচ্ছে না। পুরো কলোনিতে থমথমে ভাব।

মইন ভাইকে সবাই পছন্দ করত। সে মেজদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের বাসায় প্রায়ই এসে আব্বার সাথে তর্ক জুড়ে দিত, "চাচা যুদ্ধ শেষে এই রাজাকারগুলারে বাঁচায় রেখে বড় ভুল করছে আপনাদের জেনারেশন। এখন তার খেসারত দিচ্ছি আমরা।" সদা হাসিখুশি আলাপী এই মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে আব্বা পর্যন্ত অসুস্থ শরীর নিয়ে বাইরে বের হল। মা তাকে বের হতে দিতে চাচ্ছিল না। কিন্তু আব্বা কোন কথাই মানল না।

হাসপাতাল, মর্গ সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি চলল। এলাকার মুরব্বিরা সবাই মিলে থানায় গিয়ে খোঁজ করল। কাজ হল না। পুলিশ জানাল

তারা যাদেরকে ধরেছে তার মধ্যে রহমান আছে তবে মইন ভাইয়ের কথা তারা জানে না।

রাতে আব্বা হতাশ চেহারায় বাসায় ফিরল। ছেলেটাকে মনে হয় মেরে গুম করে ফেলেছে, শুধু এতটুকুই বললেন। বাসায় একটা শোকের ছায়া নেমে এল। মেজদার চিন্তায় মা অস্থির হয়ে পড়ল। অনেক দিন পর আব্বাকে দেখলাম স্বাভাবিক গলায় মাকে বলছে, অত চিন্তার কিছু নাই। আল্লাহপাক যার কপালে যা লিখে রেখেছেন, তাই হবে।

২৭ মে

মারাত্মক দুঃসংবাদ পেলাম। আমার ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। কবে হবে সেটা কেউ বলতে পারছে না। স্যারেরা বললেন, দেখ এ বছর আর পরীক্ষা হয় কিনা! এ নিয়ে তিনবার পরীক্ষার তারিখ পেছাল। পরীক্ষা নিয়ে এমন অনিশ্চয়তা থাকলে পড়ালেখা করতে ইচ্ছা করে না। ভাবছি দু'তিন দিন পড়ার বইয়ের ধারের কাছে ঘেঁষব না। গল্পের বই পড়ব। লাইব্রেরি থেকে বেশ কিছু গল্পের বই এনেছিলাম। কোনটা রেখে কোনটা আগে পড়ব ঠিক করতে পারছি না। তপু জুলভার্নের বই পড়তে বলল। জুলভার্ন আমার প্রিয়। কিন্তু এখন সায়েন্স ফিকশন পড়তে ইচ্ছা করছে না। শেষমেশ শরৎ রচনাবলী পড়া শুরু করলাম–

এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা যেন খড়ের আগুন। দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেও পারে, আবার খপ্ করিয়া নিবিয়া যাইতেও

পারে। তাহাদিগের পিছনে সদাসর্বদা একজন লোক থাকা প্রয়োজন– সে যেন আবশ্যক অনুসারে বড় খড় যোগাইয়া দেয়।...

কী সুন্দর বর্ণনা। কতবার পড়েছি, তারপরও পড়তে ইচ্ছা করে। ইস আমি যদি এমন লিখতে পারতাম!

২৮ মে

আব্বা একদম স্বাভাবিক। মামাকে দেখেই, কী পেয়ারু পেয়ারা আনছনি বলে জড়িয়ে ধরলেন। পেয়ারু মামা সকালেই এসেছেন। নিমতলীর পীর সাহেবকে আনতে পারেননি, তিনি অসুস্থ। তবে পীর সাহেব তার ছেলে ছোট পীরকে আসার অনুমতি দিয়েছেন।

আমার আব্বা ধার্মিক মানুষ। ধর্ম নিয়ে অবশ্য তার কোন গোঁড়ামি নেই। আমাদের বাসায় নিয়ম করে নামাজ-রোযা যেমন হয় তেমনি গানবাজনা করতেও কোন মানা নেই। আব্বা বলেন, ধর্মের ব্যাপারে উদার হওয়া দরকার। ধর্ম নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে নবী (সাঃ) মানা করে দিয়েছেন। ধর্ম নিয়ে আব্বার এই মত আমার পছন্দের হলেও ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করা এইসব পীরদের আমার অপছন্দ। মেজদা বলতো, এরা সব ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে মানুষের সরলতাকে পুঁজি করে আখের গোছায়। মেজদার উপর আমি চোখ বুঁজে আস্থা রাখি। ও যা বলে পড়ে বুঝেশুনে বলে। এ পর্যন্ত ওর সব কথাই সত্য হয়েছে। তাই ওর প্রতিটি কথা আমি বিশ্বাস করি। আব্বা অবশ্য আধ্যাত্মিক

লোকজনকে সম্মান করেন। আর মা'র তো এসব লোকের ওপর অগাধ বিশ্বাস।

ছোট পীরের বেশভূষা অন্যসব ধর্মীয় লোকের মতই। চোখে সুরমা, গায়ে আতরের ঘ্রাণ, তবে মাথায় টুপি নেই। দাড়িও ছোট করে কাটা। পানের রসে ঠোঁট লাল। বেশ বড়সড় একটা ভুঁড়িয়ালা লোক। তাকে দেখে আমার অলৌকিক শক্তির কেউ বলে মনে হল না।

তবে পেয়ারু মামা তার প্রশংসা করতে করতে মুখে ফেনা তুলে ফেললেন। সে মস্ত বড় পরহেজগার, কামেল দরবেশ। এখন পর্যন্ত যেখানেই গেছেন সেখানেই নাকি কেরামতি দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। লোকজনের ধারণা বড় পীরের মরহুম দাদা সাহেব স্বয়ং ছোট পীরের বেশ ধরে আবার এসেছেন। সেই দাদা পীর নাকি একবার খড়ম দিয়ে নদীর উপর বাড়ি মেরেছিলেন। সেই বাড়ি খেয়ে বাণে ফুসে ওঠা নদী শান্ত হয়ে নিমতলীকে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল! ছোট পীরও একবার সেই রকম তেলেসমাতি দেখিয়েছিলেন। হাজার হাজার লোকের সামনে নিমতলীর রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় তিনি চলন্ত এক এক্সপ্রেস ট্রেনকে থামিয়ে দিয়েছিলেন!

ছোট পীর সারাদিন ঘুমিয়েই কাটালেন। তিনি মহিলাদের এড়িয়ে চলতে পছন্দ করেন। তাই মা আর আমি দূরে দূরে থাকলাম। তপুকে নিয়ে পেয়ারু মামাই তার দেখভাল করল।

২৯ মে

আব্বা বেশ স্বাভাবিক। পীর সাহেবের সাথে গল্প গুজব করলেন। তারপরেই তার মন বেজায় ভাল হয়ে গেল। মাকে বললেন, সরকারের উঁচু পর্যায়ে পীরের মুরিদ আছে। পীর সাহেব তাদের দিয়ে তার পেনশনের টাকা পাবার ব্যবস্থা করে দেবেন বলে কথা দিয়েছেন। খবর শুনে মাও খুশি হলেন। তখনই দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে ফেললেন।

মইন ভাইয়ের বাবামাও পীরের সাথে দেখা করতে এলেন। পীরের সাথে কথা বলে তারাও খুশি। পীর সাহেব তাদেরকে বলেছেন, মইন ভাই ভালো আছেন। কদিন বাদেই তিনি ফিরে আসবেন। ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি তাকে হেফাযত করবেন। কলোনির অন্য অনেকেও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এলো। পীর কাউকেই নিরাশ করলেন না।

কিন্তু তিনি একবারের জন্যও বাসার বাইরে বের হলেন না। এমনকি জুমার নামাজ পড়তেও গেলেন না! তপুকে পেয়ারু মামা বলেছে, পীর সাহেবরা আল্লার পেয়ারা বান্দা। তাদের নামাজ না পড়লেও চলে। তারা সবসময় আল্লার ধ্যানে মশগুল থাকেন। তাই আল্লাহ শরিয়তের হুকুম পালন থেকে তাদের মুক্তি দিয়েছেন। সাধারণ মানুষেরা শরিয়ত মানবে, নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে। পীর পয়গম্বররা মারেফত অনুযায়ী চলবেন। তাই তারা নামাজ পড়লেন কী পড়লেন না সেটা নিয়ে কৌতূহল করাটাও গুনাহের কাজ!

ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝলাম না। পীর হয়েছেন বলে কি তিনি মুসলমান না? রাসূল (সাঃ) যদি নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে

থাকনে, তবে তারা কেন সেটা থেকে মাফ পাবে? তারা কি তাঁর থেকে বড় আল্লায়ালা লোক? এগুলো বলতেই মা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, তোর এসব মুখে আনার দরকার কী? পীর সাহেবদের নিয়ে এমন কথা বললে অমঙ্গল হয়। আমার নানাজান এমন ধরনের কথা বলে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন!

মা'র কথায় খানিকটা ভয় পেলাম। কিন্তু লালসালু উপন্যাসের ভণ্ড মজিদের কথা আমার মনে আছে। মন বলছে আমাদের ছোট পীরও ঐরকম এক ভণ্ড।

ঘরের ভেতর প্রায় বন্দী হয়ে আছি। পীর সাহেবের সামনে পড়লে তিনি বিরক্ত হতে পারেন বলে বেশি একটা বের হতে পারছি না।

৩০ মে

কোচিং ক্লাসে যেতে চেয়েছিলাম। মা বারণ করল। আজ পীর সাহেব আব্বাকে তদ্বির দিবেন, তাই সবার বাড়ি থেকে বের হওয়া মানা।

সন্ধ্যা নাগাদ পীর সাহেব আব্বাকে নিয়ে বসলেন, ভাইছাব আসেন কিছু গল্পগুজব করি।
সজলের মা চা দাও বলে আব্বা ভাল মানুষের মত পীর সাহেবের কাছে গেলেন।
ভাইছাবের পুরা নামটা বলেন, পীর বললেন।
মোহাম্মদ মাতলুবুর রহমান।
বাড়ি?

ভেদরগঞ্জ।
বাবার নাম?
করিমউদ্দিন রহমান।
ডান হাতটা দেন।
আব্বা এগিয়ে দিলেন।
পীর সাহেব আব্বার হাতটা হাতের ভেতর নিয়ে তালুতে বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষতে লাগলেন। কী হইছে আপনার?
কিছুই না!
সত্যি কইরা বলেন।
কিছুই না।
আবার মিথ্যা কয়! সত্যি বলেন? পীর সাহেবের গলা চড়ে।
ঘুম আসতেছে, আব্বা বললেন।
তা তো আসবোই, পীর ব্যাঙ্গাত্মক সুরে বলেন। ঘুমাইতে চান?
আব্বা ঘুম ঘুম চোখে মাথা নাড়েন। নাটকে দেখেছি এভাবে হিপনোটাইজড করা হয়। আমার মনে হল পীর সাহেব আব্বাকে সেটাই করার চেষ্টা করছেন।
কতোক্ষণ ঘুমাবি?
আব্বার চোখ প্রায় বুজে এসেছে। ঘুম ঘুম স্বরে তিনি বললেন, অনেকক্ষণ...
না, তুই একবারে ঘুমাইবি। পীর সাহেব ধমকে উঠলেন।
আব্বা মাথা নাড়লেন। ঘুমের চোটে তিনি চোখ খুলতে পারছেন না।
বল, একবারে ঘুমাব।
আব্বা সুর করে বলল, একবারে ঘুমাব।
ঠিক আছে। ঘুমানোর আগে কিছু একটা নিয়ে যাবি। আর আসবি না, বুঝছস?

আব্বা মাথা ঝাঁকান।
বল আচ্ছা।
আচ্ছা। এবার ছাড়েন।
দাঁড়া এত তাড়া কীসের! ভয় লাগতাছে এ্যাঁ? আইজ তোর একদিন কি আমার একদিন। কী নিয়া যাবি বল?
কী নিব?
এই বাড়ি থেকে তোর সাগরেদকে নিয়ে যাবি।
নিয়ে যাব।
বল আল্লার কসম নিয়ে যাব। পীর আবার ধমকে ওঠেন।
আল্লার কসম নিয়া যাব, আব্বা ঘুমের ভেতরই বললেন।
তিনবার বল।
আল্লার কসম নিয়া যাব। আল্লার কসম নিয়া যাব। আল্লার কসম নিয়া যাব।
এবার ঘুমা, বলে পীর সাহেব আব্বার হাত ছেড়ে দিলেন।
আব্বা প্রায় সাথে সাথেই সোফায় মাথা দিয়ে নাক ডাকতে শুরু করলেন।
পীর সাহেব বললেন, কোন চিন্তা নাই। ঘুম থেইকা ওঠার পর উনি একদম ঠিক হইয়া যাবেন। সবাই বলেন আমিন।

৩১ মে

সকাল থেকে তোতাটাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তপু ঘুমাবার আগেও ওটাকে দানাপানি খাইয়েছে। সকালে ওটা উধাও! খাঁচাটা যেমন ছিল তেমনই আছে। কী ভাবে ওটা পালাল কেউ বলতে পারছে না।

খবর শুনে পীর সাহেব সবাইকে আলহামদুলিল্লাহ বলতে বললেন। তার ভাষায়, "ভাইছাবের ঘাড়ের বদ জিনডা যাওয়ার সুময় তার ছাগরেদকে নিয়া গেছে। এই বাসায় যে সমস্যা ছিল তা খতম।"

তপু কিছুতেই বিশ্বাস করছে না যে তার তোতা বদ জিনের সহকারি ছিল। সে অনেক খোঁজাখুঁজি করে হয়রান হয়ে মন খারাপ করে বসে থাকল। শুনলাম পেয়ারু মামা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, "মন খারাপ খরতাছ ক্যান? কী বিপদের ভিতরে আছিলা ভাব! বদ জিনে তোতার সুরতে বাসায় আস্তানা গাড়ছিল। তুমার যে ক্ষেতি করপার পারে নাই, হেইডাই হাজার শুকর। ভাবিছাবের লাহান নফল নামায পড়গা, যাও।"

মা পীরের তেলেসমাতিতে পুরো মুগ্ধ। আমাকে এসে বলল, সবই আল্লাহর ইচ্ছা। নইলে ওনার মত বুজুর্গান আমাদের বাড়িতে আসেন?

ঘুম থেকে ওঠার পর আব্বা কালকের কথা কিছুই মনে করতে পারলেন না। পীর সাহেবের সাথে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করলেন। পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে অর্থমন্ত্রী সরকারি কর্মচারীদের পেনশনের টাকা দ্রুত দিয়ে দেয়ার তাগিদ দিয়েছেন। এই খবরে তাকে খুব আনন্দিত মনে হল। স্বাভাবিক মানুষের মত এলাকার খোঁজখবর নিতে বাইরে বের হলেন।

তোতা হারিয়ে যাওয়ায় আমার মনও খুব খারাপ। শুভ্রার ধারণা তোতা মাথা ন্যাড়া করতে নিজের বাড়িতে গেছে। কাজ শেষ হলেই ফিরে আসবে। আমি তার কল্পনায় বাধা দিলাম না। অল্প কদিনেই তোতাটা

কত আপন হয়ে গিয়েছিল! আমার লিমনের কথা মনে পড়ছে। ও যদি তোতাটার মত হারিয়ে যায় তবে আমার কী হবে? বারন্দায় শূন্য খাঁচাটা আলতো করে দুলছে। নিজেকে আমার হঠাৎ ওই খাঁচার মতই মনে হতে লাগল।

১ জুন

ভয়ানক একটা কাণ্ড ঘটেছে। কাউকে বলব কিনা বুঝতে পারছি না। কেউ কি বিশ্বাস করবে?

গোসলে গিয়েছিলাম। আমাদের গোসলখানার দরজার একটা স্ক্রু আনেক আগে থেকেই খোলা। স্ক্রু লাগাবো লাগাবো করে এখনো লাগানো হয়নি। ফুটোটা কাগজ দিয়ে বুঁজে রাখা হয়েছে। হঠাৎ মনে হল ওই ফুটো দিয়ে কেউ আমাকে দেখছে। আমি তাকাতেই সরে গেল। ভালোমত খেয়াল করে দেখলাম, কাগজাটা নেই। বাইরে বের হয়ে কাউকে পেলাম না। বাতাসে কেবল আতরের কড়া ঘ্রাণ। এ বাড়িতে একজনই আতর মাখে, পীর সাহেব! খুব অবাক হলাম। ভয়ও পেলাম। মাকে বলতে চেয়েছিলাম। উল্টো ঝাড়ি খাবার ভয়ে বলার সাহস পেলাম না। তপুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, পীরকে তোর কেমন মনে হয়রে?
তপু খানিকক্ষণ থম মেরে থেকে বলল, আমার মন কি বলছে জান আপুনি?
কী বলছে?
মন বলছে, তোতাটাকে পীর সাহেবই সরিয়েছেন।
হতে পারে, আমি মাথা ঝাঁকালাম।

হতে পারে না হয়েছে। বিকেলেই তা খানিকটা পরিষ্কার হল। টেবিলে বসে পড়ছিলাম। হঠাৎ দেখি পেছনে কচা! মনে হল কিছু বলতে চায়। আমি অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে এদিক ওদিক তাকিয়ে আমার কাছ ঘেঁষে বলল, আফুনি আফনারে একখান ঘটনা খইতাম। কাওরে খইতে ফারতেন না।

বললাম, ঠিক আছে।

কন আল্লার কিরা।

আল্লার কিরা।

আমার মাতায় হাত রাইকা কন।

আমি ওর মাথায় হাত রেখে কসম কাটলাম।

ঘটনাডা হইল আফা, আমি দেখছি জিনডারে।

জিন দেখছিস মানে?

হ আফা দেখছি। তোতাডা জিনডারে উড়াইয়া দিতাছে। সে এমন ভয়ে ভয়ে বলল যেন জিনটা আশেপাশেই আছে।

কী আবোল তাবোল বলছিস?

হাছা কইতাছি আফা। রাইতে আমি আব্বার লগে মাডিতে ঘুমাইতেছিলাম। পেশাবের বেগ পাইয়া তাকাইয়া দেহি ঘরে সাদা ধবধবা একখান জিন। হে তার জানালা থেইকা আমাগো তোতাডারে বাইর কইরা পকেট দিয়া উড়াইয়া দিল!

বলিস কী?

হ, আফা। জীরবনে এই পরথম জিন দেকলাম।

সুরমা দিয়া চুখ, লম্বা দাড়ি দেখতে এক্কেবারে আমাগো পীর সাহেবের লাহান।

তাই নাকি! আমি অবাক হলাম।

হ, আফা। সক্কালে কইছি আব্বারে। হে কয়, খোয়াব।

কচার গল্প শুনে ধারণা আরো বদ্ধমূল হল যে পীর সাহেব কেরামতি দেখানোর নামে নিজেই তোতটাকে উড়িয়ে দিয়েছেন।

মাকে ঘটনাটা বললাম। বিশ্বাসই করল না। উল্টো আমাকে কড়া গলায় বলল, পীর পয়গম্বরদের নিয়ে আজেবাজে সন্দেহ করলে, ক্ষতি হয়।

এই মহিলাকে বোঝায় কার সাধ্যি!

রাতে ফরহাদ ভাই এলেন। বেশ কিছুদিন শহরের বাইরে ছিলেন বলে আসতে পারেননি। আমার সাথে কেমন আছ, কী করছ, পরীক্ষা কবে এই টাইপের কথাবার্তা হল।

পীর সাহেবের কাজ শেষ। কাল চলে যাবেন। তাকে কিছু নজরানা দেয়া উচিৎ। হাতে টাকাপয়সা নেই। মা তার সোনার দুল জোড়া দেয়ার মানত করেছে। তাকে বুঝিয়ে লাভ নেই। তাই চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে হল।

২ জুন

বাসা খালি। দলবল নিয়ে পীর সাহেব চলে গেছেন। বাইরের খোঁজখবর নিতে আব্বাও বেরিয়েছে। তপু গেছে বৃষ্টির মধ্যে ফুটবল খেলতে। শুভ্রাও বাসায় নেই, পাশের বাসায় পিকনিক পিকনিক খেলছে। আমিও বের হব ভাবছিলাম। বৃষ্টির কারণে মত পাল্টেছি।

মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। যেন আকাশ কারো জন্য কাঁদছে। আকাশের কান্না দেখলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। চোখে আপনাআপনিই জল চলে আসে। সমস্ত দুঃখের ছবি জল চোখে ভাসে।

আমাদের সংসারের বর্তমান অবস্থাটা আমি চিন্তা করতে লাগলাম। একটা হালভাঙা জাহাজ মাঝসাগরে যেন কোন মতে ভাসছে। জাহাজটি যে কোন সময় ডুবে যেতে পারে। এর ক্যাপ্টেন দিকভ্রান্ত, ফার্স্ট মেট নেশাতুর উদভ্রান্ত, নাবিকেরা ছন্নছাড়া, যাত্রীরা অসহায়। সামনের দিনগুলোতে কী হবে আমি জানি না। আব্বা যদি পেনশনের টাকা না পায়, ভাইয়া যদি টাকাপয়সা না দেয়, মেজদা যদি সংসারের হাল না ধরে তাহলে কীভাবে আমরা চলব ভাবতেও ভয় লাগে। গ্রামে আমাদের জমিজমা নেই, শহরে সঞ্চয়ও নেই। পরিবারের সম্পদ বলতে ভাইয়া আর মেজদা। ভাইয়াতো মুখ ফিরিয়েই রেখেছেন। এখন মেজদাই ভরসা। সেও যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়! আমার আর ভাবতে ইচ্ছা করে না। কেমন যেন অসহায় ক্লান্ত লাগে।

লিমনের কথা ভাবলেও আজকাল এমন হয়। হারিয়ে ফেলার বোধ হয়। ওর কোন খোঁজখবর নেই। একেবারে লাপাত্তা। ওর কী খারাপ কিছু হয়েছে? আশঙ্কায় আমার বুকটা কেঁপে ওঠে। একই সাথে কার্নিশে বসে কাকভেজা হতে হতে একটা কাক তারস্বরে ডেকে উড়ে যায়। আমার ভয় গাঢ় হয়। আকাশ মেঘে অন্ধকার হয়ে আসছে। বিকট শব্দে বিদ্যুৎ চমকায়। জানালা খোলা রাখতে সাহস হয় না। বন্ধ করে দেই। কারেন্ট চলে গেছে। অন্ধকার ঘরে আমার আরো ভয় লাগে। আপাতত লেখা বন্ধ, মার কাছে যাই।

আব্বা ফিরেছেন। ছাতা নিয়ে যাননি। ভিজে একসার। তার মেজাজ খুব খারাপ মনে হল। ভাত খেয়ে শুয়ে শুয়ে গজগজ করতে লাগলেন। মইন ভাই ফিরে এসেছেন। তাকে নিয়েই আব্বার খেদ। মইন ভাই মন্ত্রীর পাজেরোতে করে কলোনিতে এসেছেন। এসেই সবার কাছে সরকারের গুনগান শুরু করেছেন। এলাকার ছেলেপেলেদের উচ্ছৃঙ্খল, ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম করে দেশের ক্ষতি না করার উপদেশ দিয়েছেন। এলাকার অন্যসবার মত আব্বাও এতে হতবাক। এসব ডিগবাজি খাওয়া দালালদের জন্যই দেশের আজ এ অবস্থা, আব্বা গজগজ করতেই থাকলেন।

মইন ভাইয়ের ডিগবাজির ঘটনায় আমারও খুব অবাক লাগল। মেজদা একবার বলেছিলেন, "দেশে যদি মইনের মত আদর্শবান, সৎ আরো কিছু ছাত্রনেতা থাকত তবে দেশটাই বদলে যেত।" আমি কোনভাবেই হিসাব মেলাতে পারলাম না। তপু এসে বলল মইন ভাই কলোনির ছেলেপেলেদের মিষ্টি খাওয়ার টাকা দিয়েছেন। একশ টাকা পেয়ে তপু বেশ খুশি। আমি খুশি হতে পারলাম না। টাকা এমন এক জিনিস যা বিনা কারণে কেউ কাউকে দেয় না।

৩ জুন

চিঠিটা পাবার পর থেকেই আব্বা আগের রূপে ফিরে গেছে। এটা ভাঙছে ওটা ভাঙছে। সরকারের চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করে ছাড়ছে।

চিঠিটা একটা নোটিশ। তাতে এই বাসা ছেড়ে দিতে আমাদের দুই মাসের সময় দেয়া হয়েছে। যেহেতু আব্বা অবসরে গিয়েছেন। সেহেতু

এখানে থাকার মেয়াদও দিনদিন শেষ হয়ে আসছে। সরকারি কর্মচারীদের জন্য এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আব্বা তা মানতে পারছেন না। এমনিতেই মেয়াদের আগেই জোর করে তাকে অবসরে পাঠান হয়েছে। তার উপর পেনশনের টাকার কোন সুরাহা হয়নি। এর মধ্যে এই নোটিশে আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা।

আব্বার টেনশনের করাটা অযৌক্তিক কিছু নয়। দুই মাস খুব অল্প সময়, দেখতে দেখতে চলে যাবে। এর পর আমরা কই যাব, কী খাব এই চিন্তায় তার মাথা খারাপের যোগাড়। সত্যিই গাছতলায় যেয়ে দাঁড়ান ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।

আব্বার মেজাজ একসময় শান্ত হয়ে এল। ক্লান্ত হয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি মা রান্নাঘরে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মাকে এতটা ভেঙে পড়তে কখনো দেখিনি। তাকে সান্ত্বনা দেব কী আমার নিজেরই কান্না চাপা দায় হয়ে পড়ল।

পুরো বাড়িটা সারাদিন মরা বাড়ির মত সুনসান হয়ে থাকল। দুপুরে কারোরই ঠিকমত খাওয়াদাওয়া হল না। রাতেও চুপচাপ। আটটার দিকে ফরহাদ ভাই এলেন। তপুর সাথে তার পথে দেখা হয়েছিল। আব্বার খবর শুনে খোঁজ নিতে এসেছেন। তিনি মেপে দেখেন আব্বার প্রেশার মারত্মক হাই। তাড়াতাড়ি তাকে ওষুধ খাওয়ানো হলো। যাবার আগে ফরহাদ ভাই মাকে বারবার চিন্তা করতে মানা করলেন। বললেন কাল আবার এসে দেখে যাবেন।

ফরহাদ ভাই ঘন ঘন বাসায় আসুক সেটা আমি চাই না। তিনি এলেই আমার কেমন যেন বিব্রত লাগে। অথচ এ মুহূর্তে তিনিই আমাদের সবচেয়ে উপকারী একজন হিসেবে দেখা দিয়েছেন। ইচ্ছা না থাকলেও পরিস্থিতির ফেরে কিছু জিনিস মেনে নিতে হয়। যেমন এখন ফরহাদ ভাইকেও আমার মেনে নিতে হচ্ছে। এ জন্যই হয়ত রুশো বলেছেন, "ম্যান ইজ বর্ন ফ্রি অ্যান্ড হি ইজ এভরিহয়ার ইন চেইনস।" দুনিয়া বড় অদ্ভুত জায়গা।

৪ জুন

জানালা দিয়ে রোদ এসে তেরছা করে মুখের উপর পড়েছে। আমি চোখ মেলে তাকালাম। বাইরে ঝকঝকা নীল আকাশ। লাল একটা লেঞ্জা ঘুড়িকে ঘিরে দুইটা চিল চক্কর খাচ্ছে। অনেকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দেখলাম। তারপর চোখ ফিরিয়ে ঘরে তাকাতেই কষ্ট হতে লাগল। বুক ভেঙে যেতে লাগল এই বাসাটার জন্য।

কতদিন হয়ে গেল আমরা এখানে আছি। মনে আছে সেই ফ্রক পরা সময়ে আমি এখানে আসি। আমাদের আগের বাসাটা ছিল একতলায়; খানিকটা ছোট। তিনতলার ওপর বড় বড় রুমের এই বাসা পেয়ে আমার আনন্দ দেখে কে! এখন যে ঘরে থাকি সে ঘরেই আমি আস্তে আস্তে বেড়ে উঠেছি। প্রতিদিন তেরছা রোদটুকু মুখের উপর পড়লেই আমি সকাল হয়েছে টের পাই। তখন আর ঘুমিয়ে থাকতে পারি না। এই ঘর ছেড়ে চলে যাব ভাবতেই বুকটা খাঁ খাঁ করছে। কত্ত কত্ত স্মৃতি এখানে। শুভ্রার জন্ম, তপুর বেড়ে ওঠা, মেজদার বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স

পাওয়া উপলক্ষে মিষ্টি খাওয়া, ভাইয়ার বিয়ের অনুষ্ঠান সবকিছু এ বাসাতেই হয়েছে। এমনকি আব্বা-আম্মার ত্রিশতম বিয়ে বার্ষিকীতে আমরা ভাইবোনেরা মিলে এখানেই ফুলশয্যার আয়োজন করেছিলাম। এখানকার দেয়ালে দেয়ালে জড়িয়ে আছে আমাদের আনন্দ বেদনার সমস্ত কলরব।

কান পাতলেই শুনি মেজদা বলছে, তোর নাকতো পেত্নীর মত বোঁচা। শুনে আমি ভেউ ভেউ করে কাঁদছি। চোখ বুজলেই দেখি ভাইয়া আমার বেণী বেঁধে দিচ্ছে, মা গালে তুলে খাইয়ে দিচ্ছে, আব্বার কোলে বসে দুলে দুলে টম অ্যান্ড জেরি দেখছি... দেখি তপুর সাথে তুমুল ঝগড়া শেষে গাল ফুলিয়ে দুজন আড়ি নিচ্ছি, শুভ্রা আমার গলা ধরে বলছে, "রাজকুমারের গল্পটা শোনাও না আপুনি।" আহ! এখানেই যদি সারাজীবন থাকা যেত। জানি সম্ভব না। পৃথিবী ছাড়ার মতই কলোনির এই বাসা আজ বাদে কাল ছেড়ে যেতে হবে। এখন কেবল দিন গোনা। চেপে রাখতে গিয়েও দীর্ঘশ্বাস না ফেলে পারি না।

আব্বা একদিনেই অনেক বুড়িয়ে গেছে। আমাকে দেখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। যেন মা হারা এতিম কোন শিশু। আমি তাকে মুখে তুলে খাইয়ে দিলাম। কোন কথা হল না।

মার মুখও শুকনো। সারারাত বোধ হয় ঘুমাননি। বললেন কাল ছোট ফুপুর বাসায় যাবেন, আমি যেন কোথাও না যাই।

কোচিংয়ে গেলাম। লিমনের কোন খোঁজ কারো কাছে নেই। ক্লাসে তেমন মন বসাতে পারলাম না। তমারও মন খারাপ। ওর বিয়ের

কথাবার্তা চলছে। ও রাজি না। আমার পরামর্শ চাইল। হুট করে কিছু করতে ওকে নিষেধ করলাম।

কোচিং ক্লাস শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে। এটি কলেজের একটা বাড়তি প্রজেক্ট ছিল। ইন্টারে যারা রেজাল্ট ভাল করেছে তাদের জন্য এই কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কলেজের কিছু ইয়ং স্যার স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বিনাবেতনে এই কোচিং চালু করেছিলেন। বারবার পরীক্ষা পেছানোতে তাদের উৎসাহে ভাটা পড়েছে। ক্লাস চালিয়ে যেতে তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। তাছাড়া দেশের অবস্থাও বেশি একটা ভাল না। দু'দিন ক্লাস হয়তো চারদিন হরতালের কারণে বন্ধ থাকে। স্টুডেন্টরা কেউ আসে কেউ আসে না। স্যারদের যুক্তি এর চেয়ে ক্লাস একবারে বন্ধ করে দেয়াই ভাল। কোচিং বন্ধ হয়ে গেলে কী করব? হাতে অফুরান সময়।

বাসার সামনে রিক্সা থেকে নামতেই ফরহাদ ভাইয়ের সাথে দেখা। তিনি আমাদের বাসার দিকেই যাচ্ছিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সাথে হাঁটতে হল। আমাকে চুপচাপ দেখে তিনি বললেন, সরি তোমাকে বিরক্ত করছি বোধহয়।
না, ঠিক আছে।
তাহলে চুপ করে হাঁটছ যে?
ভাল লাগছে না।
চাচা কেমন আছেন?
একই রকম।
ওষুধগুলো ঠিকমত খাইয়েছিলে?
হ্যাঁ।

আচ্ছা, আমার উপর তুমি এত রেগে থাক কেন?
আপনি জানেন না? আমি শান্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম।
জানি।
তাহলে এত ঢং করছেন কেন? আপনাকে আমি পছন্দ করি না। তারপরও আপনি কেন নানা ছুতোয় আমাদের বাসায় আসেন জানতে পারি? আমি নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না।
প্রশ্ন শুনে খুব মজা পেয়েছেন এমন ভঙ্গিতে ফরহাদ ভাই হো হো করে হেসে উঠলেন, সবাই বড় হল কেবল তুমিই সারাজীবন ছোটদের মত থেকে গেলে!
মানে?
দেখ তুমি জান যে তোমার আব্বা আম্মা আমার চাচা-চাচী হন। চাচা-চাচীর সাথে দেখা করতেই আমি তোমাদের বাসায় যাই।
মিথ্যা বলবেন না।
মিথ্যা বলছি না। আজ তোমাকে একটা গোপন কথা বলি শোন। তুমি হয়ত জান না যে আমার আজকের অবস্থানে আসার পেছনে চাচার অবদান অনেক। আব্বা মারা যাবার পর তিনিই আমার লেখাপড়ার খরচ চালিয়েছেন...
কথাটা শুনে আমি একটা ধাক্কা খেলাম। আব্বা বা আম্মা কেউ কখনো এটা আমাদের বলেননি।
...তোমার আম্মাও আমাকে সবসময় নিজের ছেলের মতই স্নেহ করেছেন। তাই তাদের প্রতি আমি একটা কর্তব্য অনুভব করি। সেই তাগিদেই তোমাদের বাসায় সুযোগ পেলেই আসি। হ্যাঁ, তোমাকে আমি পছন্দ করতাম ঠিকই, মাকে দিয়ে চাচার কাছে বিয়ের কথাও একবার বলেছিলাম এটাও ঠিক। কিন্তু যখন জানলাম তোমার নিজের পছন্দ আছে তখন থেকে আমি সরে দাঁড়িয়েছি। বুঝলে?

নিজের পছন্দ? ফাযলামি করবেন না। কে বলেছে আপনাকে? ফরহাদ ভাই আন্দাজে ঢিল ছুড়ল কিনা বোঝার চেষ্টা করলাম।
তোমার নিজের পছন্দ নেই বলতে চাও! ফরহাদ ভাই রহস্যময় হাসি হাসলেন। আমি তার নামও বলে দিতে পারি।
তাই নাকি!
তার নাম লিমন। ঠিক বলেছি না?
এসব বানোয়াট গল্প কার কাছ থেকে শুনেছেন? আমার বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়া শুরু করল।
বলব না।
বলেন বলছি।
আরেকদিন বলব, ফরহাদ ভাই রহস্য ভাঙলেন না।

লিমনের কথা কে বলতে পারে? বাকিটা সময় মাথার ভেতর এই প্রশ্নই ঘুরপাক খেতে থাকল। নিশ্চয়ই তপু। ও ছাড়া এই কাজ আর কেউ করতে পারে না। ও চুরি করে আমার লেখা পড়েছে। বাসায় ওই একমাত্র লিমনের ব্যাপারে জানে। তপু ফিরতেই ওকে চেপে ধরলাম। ও সব অস্বীকার করল। এমনকী কোরান শরীফ ছুঁয়ে শপথ করে বলল যে ও কাউকে কিছু বলেনি। এরপরও ওকে কী করে অবিশ্বাস করি?

৫ জুন

মা'র শরীরটা ভাল না, ফুপুর বাসায় যাওয়া হল না।

আব্বা প্রায় বিছানধরা। ওষুধ চলছে।

তপু মইন ভাইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কলোনির ক্লাবে আড্ডা দিলেই তিনি ছেলেপেলেদের বখশিস দিচ্ছেন। ওর সেদিকেই মনোযোগ। কিছুতেই ওকে ঘরে ধরে রাখা যাচ্ছে না।

শুভ্রা শাড়ি পরার বায়না ধরল। পরিয়ে দিলাম। ওকে একেবারে পরীর মত লাগছে।

লিমনের কথা ফরহাদ ভাইকে কে বলল এটা এখনও বের করতে পারিনি। চিন্তা করে যাচ্ছি।

৬ জুন

মা'র সাথে ছোট ফুপুর বাসায় গিয়েছিলাম। চার তলা আলিশান বাড়ি তাদের। ফুপা ডাক্তার। ফুপুর ছেলেমেয়েরা সবাই বিদেশে থাকেন। তার বাসায় শেষ কবে এসেছি মনে পড়ে না। ফুপু নিজেও তেমন আসেন না। কলোনির বাসায় আসতে তার নাকি লজ্জা লাগে। আব্বাকে অনুযোগ করে ফুপু একবার বলেছিলেন, "ভাইজান আপনার সাথের সবাই কত কিছু করে ফেলল আপনিই কেবল তলায় পড়ে রইলেন!" আব্বার জবাবটা মা এখনো গর্ব করে বলেন, "সালেহা আমি দুই নম্বরি করে প্রাসাদে থাকতে চাই না, যেখানে আছি ভাল আছি, আলহামদুলিল্লাহ। তোমার লজ্জা লাগলে তুমি আর এসো না।"

সেই ফুপুর বাসাতেই মা কেন আজ আসতে বাধ্য হয়েছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিছু টাকা দরকার। সংসারে খুব টানাটানি চলছে। এখান থেকে ওখান থেকে টোকাটুকি করে মা সংসার চালাচ্ছে।

আমাদের জমিজাতি যা ছিল বেচে আব্বা ভাইয়াকে বিদেশ পাঠিয়েছিলেন। সেই ভাইয়াও বিপদের দিনে চোখ বন্ধ করে আছে। অবশ্যই উপায় না পেয়ে মা ফুপুর কাছে এসেছে। ফুপুর কাছে ছোট হতে মন সায় দিচ্ছিল না। তারপরও উপায় নেই।

ফুপু খুব মনযোগ দিয়ে মার কথা শুনলেন। আব্বার শরীরের খোঁজখবর নিলেন। তারপর শুরু করলেন, দেখ ভাবি এমন হবে তা আমি আগেই বুঝেছিলাম। নীতি ধুয়ে পানি খেয়ে কী আর পেট চলে... ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার কথা আমার অসহ্য লাগছিল। মনে হচ্ছিল এখুনি তার মুখে থুতু দিয়ে এখান থেকে বের হয়ে যাই। মাকে দেখলাম অসহায়ের মত ফুপুর কথার ঝাপটা সহ্য করছে। তাকে দেখে বড্ড মায়া লাগল। ডুবন্ত একটা জাহাজকে বাঁচাতে দিনের পর দিন একা একজন মহিলা কতই না কষ্ট করছে। অথচ এ নিয়ে কখনো তাকে অনুযোগ করতে দেখি না। মাঝে মাঝে খালি বলে, কী মানুষটা কী হয়ে গেল!

অনেক উপদেশবাণী শুনিয়ে টুনিয়ে ফুপু আম্মার হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিলেন। পরিমাণে সামান্য। ভাড়াটেরা নাকি ঠিকমত ভাড়া দিচ্ছে না, ফুপার রোগীও কমে গেছে এরকম নানা বাহানা শুনালেন। ফেরার আগে আবার বললেন, "মেয়ে বড় হয়েছে। বিয়েটিয়ে দিয়ে দাও। ঘরে তো খানেয়ালা কম নেই।" খেয়াল করলাম ফুপুর কথায় মা'র চোখমুখ শক্ত হয়ে গেছে। বেশ কড়া ভঙ্গিতে একটা জবাব দিতে গিয়েও সামলে নিয়ে তিনি বললেন, দেখি কী করা যায়।

আমি মনে মনে শপথ নিয়ে ফেললাম, আমি জীবনে যখন অনেক বড় হব, মা'র হয়ে এই ফুপুকে আমি তখন বেশ কিছু কড়া কথা শুনিয়ে যাব।

৭ জুন

তপু হাতে নাতে ধরা পড়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। দেখে আমার চোখ ছানাবড়া। কড়া ধমক লাগালাম। ও একটুও লজ্জিত হল না। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে সিগারেট ফেলে ঘুমাতে গেল!

ও যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। ইদানীং ওর ভেতর একটু উদ্ধত, রাফ অ্যান্ড টাফ একটা ভাব খেয়াল করছি। বয়সের তুলনায় খানিকটা বড় বড় ভাব ধরার চেষ্টাও আছে। ওর কণ্ঠস্বরেও তা প্রকাশ পাচ্ছে, আচরণেও। যখন খুশি বাইরে চলে যায়। আগে মাগরিবের আজান হলেই ফিরত, এখন দেরি করে। ব্যাপারটা মা নিজেও খেয়াল করেছে। কিন্তু এ নিয়ে তপুকে কোন শাসন করতে দেখি না। মা'র মানসিক শক্তি ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে, টের পাওয়া যায়। তাকে তপুর সিগারেট খাওয়ার বিষয়ে বললাম। কোন ভাবান্তর হল না। ক্লান্তভাবে বললেন, "যা খুশি করুক। আর পারি না। ওকে আল্লার নামে ছেড়ে দিয়েছি।"

আব্বা অসুস্থ, মা বিষণ্ন, তপু নষ্ট হবার পথে– কী করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। মেজদাকে দ্রুত একটা চিঠি লিখতে হবে।

৯ জুন

লিমন ফিরে এসেছে। কোচিং ক্লাসে ওর সাথে দেখা হলো। ওর ভিসা হয়ে গেছে। তিনদিন পর ফ্লাই করবে। শেষবারের মত সবার সাথে দেখা করতে এসেছে।

ওর সাথে কথা বলার কোন আগ্রহই বোধ করলাম না। ছবি তুলতে চেয়েছিল। তুললাম না। ওর প্রতি কেন জানি খুব ঘৃণা হচ্ছিল। কেন? এমন হতে পারে সেটা ও আমাকে আগেই বলেছিল। তাহলে? জানি না। ওকে আমার পুরোপুরি অসহ্য লাগছিল। শরীর খারাপের ছুতো দিয়ে তাই ক্লাস শেষ হবার আগেই চলে এলাম। ও শেষবারের মত কিছু বলতে চেয়েছিল। শুনিনি। কেন এমন করলাম? জানি না।

কীভাবে বাসায় এসেছি তা নিজেরই মনে নেই। খালি মনে আছে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে বসেছিলাম। খাওয়ার জন্য মা একবার দরজা ধাক্কিয়েছিল। উঠিনি।

এখন রাত বাজে দশটা। আয়নায় নিজের চেহারা দেখলাম। টকটকে লাল চোখ। মনে হচ্ছে ফেটে এখুনি রক্ত বের হবে। ব্যথায় চোখ খুলে রাখতে পারছি না। তবুও লিখছি। আজ রাতে আমার যদি কিছু একটা হয়ে যায় তবে তার জন্য দায়ি আমিই, অন্য কেউ নয়।

১০ জুন

প্রচণ্ড জোরে দরজা ধাক্কানোর শব্দে জেগে উঠলাম। মরে গেছি না বেঁচে আছি প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না। চোখ জুড়ে অন্ধকার। নিজেকে চিমটি কেটে দেখলাম। খানিকবাদে বুঝলাম প্রচণ্ড ব্যথায় চোখ খুলতে পারছি না। রাতে ঘুমের ভেতরও কেঁদেছি। কোন মতে হাতড়ে হাতড়ে দরজা খুললাম। চরম উত্তেজিত গলায় তপু যা বলল তার সারমর্ম হল, রাজধানীতে পুলিশের সাথে ছাত্রদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কজন ছাত্র মারা গেছে বলে খবর এসেছে। শোনা যাচ্ছে তাদের ভেতর আমাদের শহরেরও একজন আছে। মেজদাকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় সবাই অস্থির। মা জায়নামাজ ছেড়ে উঠছেনই না, আব্বা অসুস্থ শরীর নিয়েই খবর নিতে বাইরে ছুটেছেন। পুরো কলোনিতে থমথমে অবস্থা।

১০ জুলাই

এক মাস হলো মেজদা নেই। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। গত মাসের ঠিক এই দিনেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের গুলিতে মারা যাওয়া ছাত্রদের ভেতর আমার মেজদাও ছিল।

তার লাশ যখন এলো, পুরো শহর ভেঙ্গে পড়েছিল আমাদের বাসায়। এই কলোনিতে এমন কেউ নেই যে সেদিন কাঁদেনি। ফুলের পাহাড়ের নিচে হাসি মুখে শুয়ে ছিল মেজদা। কে বলবে সে মৃত? আমার মনে হচ্ছিল এখুনি সে কথা বলে উঠবে। গাল টিপে দিয়ে বলবে, তোদেরকে চমকে দিতে কেমন না বলেই চলে এলাম দেখ!

মেজদাকে তার বন্ধুরা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই কবর দিতে চেয়েছিল। পুলিশ তা হতে দেয়নি। মেজদাকে এখানেই, তার প্রিয় রাজেশ্বরী'র তীরে মাটি দেয়া হয়েছে। হিজল গাছের ছায়ায় সে শিশুর মত ঘুমাচ্ছে।

মেজদাকে শেষ দেখা দেখতে মইন ভাই এসেছিলেন। কাছের বন্ধুর মৃত্যুতে তিনি ছিলেন শোকার্ত, বিমর্ষ। তিনি আব্বাকে সেদিন কথা দিয়েছিলেন আমাদের পরিবারের জন্য তিনি যথাসাধ্য করবেন। তিনি কথা রেখেছেন। কদিনের ভেতেরই তিনি ভোজবাজির মত আব্বার পেনশনের টাকা পাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আব্বার জন্য সরকারের তরফ থেকে একটা বাড়িরও ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। কলোনি ছাড়লেই আমরা সে বাসায় উঠতে পারব!

মেজদার মৃত্যু আব্বাকে বড্ড উদাস করে দিয়েছে। ধর্মে কর্মে মনযোগ বেড়েছে তার। নিয়মিত পাঁচ বেলা মসজিদে যান। বাকিটা সময় কাটান খান বাবার দরগায়। মাঝে মাঝে গভীর রাতে উঠে মেজদার কবরের কাছে চলে যান। ঘরের হাল হকিকত নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই, একেবারে অন্য দুনিয়ার মানুষ হয়ে গেছেন।

মা প্রায় সারাক্ষণই কাঁদেন। মেজদার নাম ধরে ডাকাডাকি করেন। তিনিও কেমন যেন ভুলোমনা হয়ে গেছেন। রান্না করেছেন কী করেননি মনে করতে পারেন না। তপুকে হঠাৎ হঠাৎ মেজদা বলে ভুল করেন। বলতে গেলে জায়নামাজেই তার দিন কাটে।

এক মাসেই তপু অনেক বড় হয়ে গেছে। বাইরে কম যায়। পড়ালেখায় আবার মন দিয়েছে। মেজদার মৃত্যু যেন ওকে এক ধাক্কা দিয়ে ঠিক রাস্তায় নিয়ে এসেছে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ– সংসারের সমস্ত দেখভাল ওই করে। ওই এখন এ বাড়ির কর্তা।

ছোট্ট শুভ্রাও খানিকটা বড় হয়ে গেছে। বেশ বুঝদার ভঙ্গিতে কথা বলে। এটা ওটা খাবার জন্য বায়না ধরে কান্নাকাটি করে না। আগের শুভ্রার সাথে এখন ওকে মেলানো দুষ্কর।

ফরহাদ ভাই নিয়মিতই আসেন। এই এক মাসে তিনি আরো কাছের জনে পরিণত হয়েছেন। বিপদের আত্মীয়ই বড় আত্মীয়। এই পরিবারকে তিনি যেভাবে দেখভাল করলেন, আমার আপন ভাইও বোধ হয় এতোটা করত না!

মেজদার মিলাদের দিন ভাবি এসেছিল। কোথায় নাকি বেড়াতে গিয়েছিল সেজন্য আগে আসতে পারেনি। মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বড় ভাইয়া একটা চিঠি দিয়েছে। চিঠির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে বখাটেপনার জন্যই মেজদার আজ এই অবস্থা। যাই হোক এই সময়ে সংসার হালকা করা প্রয়োজন। তাই আমার বিয়ে দেয়া অতীব জরুরি। তার সুমন্ধির শ্যালকের চাচতো ভাই বেশ ভাল পাত্র। আব্বা-আম্মা যেন তাড়াতাড়ি ভাবিকে বলে ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেলেন!

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভালোর দিকে। মেজদার মৃত্যুর তিন হপ্তা পরেই প্রচণ্ড গণআন্দোলনে সরকারের পতন হয়েছে। তিন মাস পর ইলেকশন।

আমি আছি একরকম। অসম্ভব এক শূন্যতা আমাকে পেয়ে বসেছে। সবসময় খালি খালি লাগে। চোখের সামনে মেজদার রক্তভেজা চেহারা ভেসে বেড়ায়। ওর ব্যবহার করা জিনিসপত্রগুলো দেখলে আরো বেশি কান্না পায়, ওকে আরো বেশি মনে পড়ে। তখন ওর লেখা চিঠিগুলো পড়ি। বারবার পড়ি। পড়তে পড়তে মনে হয় ও আশেপাশেই আছে।

এ মাসেই ভর্তি পরীক্ষার ডেট পড়েছে। প্রথমে পরীক্ষা দেব না ঠিক করেছিলাম। পরে একদিন স্বপ্নে মেজদাকে দেখলাম করুণ মুখে তাকিয়ে আছে।
কী হয়েছে তোর? আমি জিজ্ঞেস করলাম।
কষ্টে আছিরে, মেজদা মলিন মুখে বলল।
কেন?
তোর জন্য।
আমি কী করেছি?
তুই পড়ালেখা করছিস না। পরীক্ষা দিবি না ঠিক করেছিস। আমি এমনটা কখনো চাইনিরে!
কী করব বল? আমার যে তোকে ছাড়া একদম ভাল লাগে না। পড়ায় মন বসে না, আমি ব্যাকুল কণ্ঠে বললাম।
মন বসাতে হবে। যে করেই হোক বিশ্ববিদ্যালয়ে তোকে চান্স পেতেই হবে। আমাকে কষ্ট দিসনারে ছোটনি, মেজদা ধোঁয়ার মত মিলিয়ে গেল।

মেজদার রক্তভেজা কষ্টজর্জরিত মুখ দেখার পর আবার পড়ালেখা শুরু করেছি। তাকে আমি কষ্ট দিতে পারব না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে

ভর্তি হতেই হবে। কিন্তু চেষ্টা করেও আগের মত পড়ায় মন বসাতে পারি না। মেজদার সাথে দেখা করার ইচ্ছা হয়। মনে হয় জোর করে মরে যাই, মেজদার দেশে ঘুরে আসি। তার হাতে হাত রেখে রাজেশ্বরীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্র দেখে আসি।

১১ জুলাই

রাজেশ্বরীর পাড় ধরে হাঁটতে খুব ইচ্ছা করছিল। বিকেলে তপু, শুভ্রাকে সাথে নিয়ে বের হলাম। ফরহাদ ভাইও সঙ্গী হলেন। আগেরবারের চেয়ে এবার নদীটাকে আরো নিস্তেজ মনে হলো। নদীর এখানে সেখানে চরের বালি চিকচিক করছে। পাড় জুড়ে থাকা গাছের ঘন সারিগুলো কিছুটা পাতলা হয়ে গেছে। বাতাসে পচা মাছের গন্ধ। বেশিক্ষণ হাঁটতে ইচ্ছা হলো না।

ফেরার পথে মেজদার কবরটা ছুঁয়ে এলাম। হিজলের ছায়ায় ঢাকা ওর কবর। কবরের উপর রং বেরংয়ের ফুল ফুটেছে। ফুলে ফুলে উড়ছে রঙিন প্রজাপতি, ঘাসফড়িং আর মৌমাছির দল। যেন তারা খেলার ছলে মেজদার সাথে জমিয়ে গল্প করছে। অনেকক্ষণ ধরে আমি সেই গল্পের সুর ধরার চেষ্টা করলাম। পারলাম না।

এক বুক হিংসা নিয়ে বাসায় ফিরলাম। মেজদা, এমন কী কথা ছিল। আমাকে গল্প না শুনিয়ে তুই ওদেরকে গল্প শোনাচ্ছিস! মেজদা, এমন কেন হলো বলতে পারিস? তুই নাই, তোর রাজেশ্বরীও মৃতপ্রায়। আমাদের এই শূন্য বেঁচে থাকার অর্থ কী?

১২ জুলাই

লেখাপড়ায় কিছুতেই মন বসাতে পারছি না। ওদিকে পরীক্ষা কাছিয়ে আসছে। ফরহাদ ভাই আজও এলেন। অনেকক্ষণ ধরে আমাকে মন দিয়ে বোঝালেন। পড়া দেখিয়ে দিলেন। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাই তবে এই মানুষটার কাছে অনেক ঋণী হয়ে যাব। সে ঋণ কীভাবে শোধ হবে, জানি না।

নতুন বাসায় ওঠার সব বন্দোবস্ত প্রায় পাকা। এ মাসের শেষের দিকেই এই বাসা ছেড়ে দিতে হবে। ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। অসংখ্য স্মৃতি জলের সাথে মিশে বারবার চোখ ঝাপসা করে দিচ্ছে।

আব্বা কথা বলা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। সারাদিন কাফনের কাপড়ের মত সফেদ সাদা কাপড় পড়ে ঘুরে বেড়ান। মেজদার কবরের কাছে রাত জেগে বসে থাকেন। মেজদার সাথে তার প্রায়ই কথা হয়। তারা দুজন জোছনা রাতে রাজেশ্বরীতে ঝাঁক ঝাঁক রাজহাঁস দেখেন।

মা'র ঘোর এখনো কাটেনি। আজকেও মেজদার প্রিয় খাবার পায়েস রেঁধে বারন্দায় একনাগাড়ে বসে ছিলেন।

১৩ জুলাই

সময় কিছুতেই কাটে না। কিছু যে করব সেটাও ইচ্ছা করে না। জোর করে লিখতে বসেছি। কী লিখব ভেবে পাচ্ছি না। ফরহাদ ভাইয়ের আসার কথা। দেখি তার সাথে কথা বলে মন ভাল হয় কিনা।

সকাল সকালই আসবেন বলেছিলেন। এখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকাল। ফরহাদ ভাইয়ের পাত্তা নেই। চিন্তা হচ্ছে খুব। কেন হচ্ছে? চেষ্টা করেও চিন্তাটা সরাতে পারছি না! এটা ভাল না খারাপ লক্ষণ?
অবশেষে তিনি এলেন। হুট করে জরুরি এক রোগী দেখতে গিয়েছিলেন, তাই দেরি। ফরহাদ ভাইকে দেখেই মনটা নেচে উঠল। মন যেন অনেকক্ষণ পর একটা যুতসই অবলম্বন খুঁজে পেল! আশ্চর্য, এই লোকটা একটা স্বপ্নের মত নিবিড়ভাবে আমার মগজে ঢুকে যাচ্ছে! আমার চিন্তাভাবনা সবকিছু ওলটপালট করে দিচ্ছে! তাকে ঢুকতে দেয়া একদম উচিত না, একদম উচিত না। লিমনকে ভালোবেসে জীবনে আমি একটা বড় শিক্ষা পেয়েছি। নিজেকে আর কারো সাথে জড়াতে চাই না।

ফরহাদ ভাই অনেক্ষণ থাকলেন। তার সাথে আজ ইচ্ছা করেই দূরত্ব রাখলাম। তিনি বেশ কবার আমার কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলেন। এটা ওটা বলে এড়িয়ে গেলাম।

তিনি চলে যাবার পর নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল। তার সাথে এমনটা করা বোধ হয় উচিত হয়নি। মানুষটা আমাদের জন্য অনেক করেছেন। এখনও করছেন। বিশেষ করে আমাকে যেভাবে তিনি উৎসাহ দেন তা বলার বাইরে। এই যে তিনি নিয়মিত আসেন সেতো আমার ভালোর জন্যই। তিনি উৎসাহ দেন বলেই না পরীক্ষা দেবার স্পৃহা পাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার স্বপ্ন আঁকড়ে থাকতে পারি।

নাহ, এবার আসলে তাকে অবশ্যই সরি বলতে হবে। বলতে কি পারব? আমার কেমন লজ্জা লজ্জা লাগছে। কিন্তু আমাকে পারতেই হবে। না হলে শান্তি পাব না।

১৪ জুলাই

বিকেলে পড়াতে আসার কথা ছিল। ফরহাদ ভাই এলেন না। কেন এলেন না? সারাদিন ছটফট করলাম। কোন কিছুতেই মন বসাতে পারলাম না। কী হলো লোকটার!

১৫ জুলাই

আজও তার খোঁজ নেই। সারাদিন বারন্দায় বসে ছিলাম। যদি তাকে দেখা যায়। দরজায় একটু শব্দ হলেই দৌড়ে গেলাম। কিন্তু তিনি এলেন না। মা পর্যন্ত চিন্তায় পড়লেন। বার কয়েক বললেন, কী হল ছেলেটার?

নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। কেন এমন করতে গেলাম? আমি একটা আস্ত বুদ্ধু। ফরহাদ ভাই নিশ্চয়ই খুব মাইন্ড করেছেন। নিজেকে কষে দুটো চড় লাগাতে ইচ্ছা করছে।

১৬ জুলাই

সারারাত ঘুমাতে পারিনি। এপাশ ওপাশ করেছি। সকাল হতে না হতেই তপুকে নিয়ে বের হলাম। ফরহাদ ভাই শহরের আরেক প্রান্তে

থাকেন। হাসপাতালের পাশেই তার কোয়ার্টার। বেশ কবার কড়া নাড়ার পর তিনি নিজেই দরজা খুললেন। দুদিনেই এ কী হাল হয়েছে! চেনাই যায় না! আমাদের বাসা থেকে আসার পথে বৃষ্টিতে ভিজেছিলেন। তাতেই জ্বর চলে এসেছে। জ্বরে একদম কাহিল হয়ে পড়েছেন। দেখে বড্ড মায়া লাগল, নিজেকে আরো অপরাধী মনে হল।

বেশ কিছুক্ষণ তার সাথে কাটালাম। টুকটাক কথাবার্তা হল। তাকে একলা ওভাবে রেখে আসতে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু কিছু করার নেই। ওনাকে আমাদের বাসায় চলে আসতে বললাম। তিনি রাজি হলেন না। এই জ্বর নাকি তেমন কিছু না। তিন দিনেই সেরে যাবে। কাল পরশুর মধ্যে বাসায় আসবেন বললেন।

ফরহাদ ভাইয়ের অসুখের খবর শোনার পর মাকে বেশ বিচলিত মনে হলো। পারলে তখনই রান্নাবান্না করে রওনা দেন। শেষ পর্যন্ত ঝড়ো আবহাওয়া দেখে ক্ষান্ত দিলেন।

ফরহাদ ভাইয়ের সাথে দেখা হবার পর মনের গুমোট ভাবটা কেটে গেছে। তপু, শুভ্রার সাথে অনেক দিন পর বাজি ধরে লুডু খেললাম। আমিই হারলাম। বিশবার কান ধরে উঠবস করতে হলো। মজাই পেলাম। ছোটবেলায় ফিরে যাবার অনুভূতি হলো। যখন ভাইয়া, মেজদা আর আমি মিলে বাঘ সিংহের লড়াই খেলতাম। মেজদা বাঘ, ভাইয়া সিংহ। আমি বাঘের পিঠে চড়ে অর্ডার করতাম, এই বাঘ সিংহটাকে এখুনি খেয়ে ফেল। অর্ডার পাওয়া মাত্রই মেজদা হালুম করে ভাইয়ার উপর ঝাপিয়ে পড়তো। মজা পেয়ে আমি হাততালি

দিতাম। ইস! সেই দিনগুলোতে যদি ফিরে যাওয়া যেত। কবে যে টাইম মেশিন আবিষ্কার হবে?

বাইরে প্রচণ্ড ঝড় হচ্ছে। বাতাসের শো শো আওয়াজ ক্রমশ গর্জনে রূপ নিচ্ছে। রাজেশ্বরী নদী নির্ঘাৎ আজ দুকূল ছাপাবে। চোখ বন্ধ করতেই দেখতে পেলাম, নদী দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে ছুটছে। একটা মানুষ ছুটে চলা সেই নদীর পাশে দাঁড়িয়ে আকুল সুরে গাইছে, আমায় ভাসাইলিরে, আমায় ডুবাইলিরে, অকুল দরিয়ায় বুঝি কূল নাইরে... কী আশ্চর্য মানুষটা অবিকল মেজদার মত দেখতে!

১৭ জুলাই

আব্বা নিখোঁজ! এ কী শুরু হলো আল্লাহ? আর কত বিপদের মুখোমুখি হতে হবে? আর কত কষ্ট পাবো আমরা?

১৮ জুলাই

আব্বাকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি! পরশু রাতে কাউকে কিছু না বলে ঝড়ের ভেতর তিনি বের হয়ে গেছেন। আর ফেরার নাম নেই। পরিচিত সব জায়গায় খোঁজা শেষ। থানা, হাসপাতাল, মর্গ কোথাও বাদ রাখা হয়নি। এলাকায় এলাকায় মাইকিংও করা হয়েছে। কোন খোঁজ আসেনি। আম্মা শোকে অস্থির। নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। মাস ঘুরতে না ঘুরতেই বাড়িটা আবার কবরখানার রূপ নিয়েছে! হে আল্লাহ, আমাদের আব্বাকে ফিরিয়ে দাও। তোমার কাছে আমার আর কোন চাওয়া নেই।

অসুস্থ শরীর নিয়েই ফরহাদ ভাই ছুটে এসেছেন। এই ঘোর বিপদের দিনে তিনি পাশে থাকায় অনেকটা ভরসা পেলাম। হে আল্লাহ, এই লোকটিকেও তুমি ভাল রেখ।

১৯ জুলাই

বলা নেই কওয়া নেই, সন্ধ্যাবেলা হুট করে আব্বা এসে হাজির। বললেন, সেদিন রাতে মেজদা এসেছিল। বৃষ্টিতে ভিজতে মেজদার খুব কষ্ট হচ্ছিল; একটা ছাতা দরকার। আব্বা ছাতা নিয়ে তাকে এগিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। রাজেশ্বরীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে তারা দুজন অনেক দূর চলে গিয়েছিলেন। বৃষ্টি থামলে মেজদা আব্বাকে জোর করে ফেরত পাঠিয়েছেন। আব্বা ফিরতে চাননি। মেজদা তাকে কথা দিয়েছে যে সমুদ্র দেখা শেষ হলেই সে বাসায় ফিরে আসবে। আব্বা যেন সে পর্যন্ত বাড়ি থেকে বের না হন।

মেজদার সাথে দেখা হওয়ায় আব্বা অনেক খুশি। বহুদিন পর খোশমেজাজে সবার সাথে গল্পগুজব করলেন। আমার পড়ালেখার খোঁজখবর নিলেন। তপুকে সাথে করে ভাল-মন্দ বাজার করে আনলেন। মাকে বললেন, "সজলের মা তৈরি থাক, বাবু যে কোন দিন এসে হাজির হতে পারে।" আব্বাকে সুস্থ স্বাভাবিক দেখে মাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

বহুদিন পর বাসায় যেন প্রাণ ফিরে এলো। কী যে ভালো লাগছে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। খুশিতে আমরা তিন ভাইবোন মিলে

জোছনা দেখতে ছাদে চলে এলাম। আকাশে বিশাল এক চাঁদ। কোন মেঘ নেই। হাজার হাজার তারায় আকাশটা ফুল বাগানের মত হয়ে আছে। আমি গান ধরলাম, কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা... তপু, শুভ্রাও আমার সাথে গলা মেলাল। গান শেষে তপু বলল, জানিস আপুনি, আমার মনে হচ্ছে আমাদের কষ্টের দিন শেষ। কেন জানি মনে হলো তপু আমার মনের কথাটাই বলেছে।

২০ জুলাই

সারাদিন মালপত্র গোছগাছ চলল। আব্বা নিজেই সব তদারকি করলেন। বিশেষ করে মেজদার জিনিসগুলো নিজ হাতে যত্ন করে তিনি গোছালেন। মেজদার চিরুনিটা পর্যন্ত তিনি তুলে রাখলেন।

কাল বা পরশু আমরা এই বাসা ছেড়ে দেবো। খারাপ লাগছে খুব। কলোনির সবাই এক এক দেখা করতে আসল। সবার চোখেমুখেই বিষাদের ছাপ। আসলে পুরো কলোনিটাই আস্ত এক যৌথ পরিবার। সুখে দুখে সবাই সবার আপনজন। আজ আমরা যাচ্ছি, কাল পরশু অন্যরাও যাবে। এটাই সত্য। তারপরও মানতে কষ্ট হয়। আস্ত একটা পরিবার ধীরে ধীরে টুকরো টুকরো হয়ে গেলে কারই বা ভাল লাগে।

এর মধ্যেই তমা এলো। সাথে তার বর তমিজ ভাই। দুদিন আগে ওরা পালিয়ে বিয়ে করেছে। সুখি সুখি চেহারা, বিয়ের পর তমা আরো সুন্দর হয়েছে। ওদের সাথে আরো একজন এসেছে। সে হলো ফরহাদ ভাই। ওনারা দুজন একই ব্যাচের বন্ধু। আমি জানতামই না! এবার বুঝতে পারলাম ফরহাদ ভাই কীভাবে লিমনের কথা জেনেছিলেন।

লিমনের কথা মনে হতেই ভেতরটা কেমন যেন হু হু করে উঠল। পুরোন অনেক কথা মনে পড়ে গেল। লিমনের সাথে কি আমি অবিচার করেছি? শেষ দিনে ও কি আমাকে বিশেষ কিছু বলতে চেয়েছিল? হয়ত চেয়েছিল হয়ত না। সেটা আর কোনদিনই জানা হবে না। যেখানেই থাকুক ও ভাল থাকুক, সুস্থ থাকুক এটাই আমার চাওয়া।

২১ জুলাই

অবাক কাণ্ড ঘটেছে। তপুর তোতাপাখিটা ফিরে এসেছে! সকাল বেলা এসেই সে সটান খাঁচায় ঢুকে টপু টপু করে অস্থির। তোতাকে পেয়ে তপু, শুভ্রা দুজনেই মহা খুশি। আমারও দারুণ লাগছে। মনে হচ্ছে কোন আপনজন ফিরে এসেছে। বারন্দায় খালি খাঁচাটাকে বাতাসে দোল খেতে দেখলে বাসায় কী যেন নেই, কী যেন নেই মনে হতো। আজ তোতাটাকে পেয়ে মনে হলো অ্যানশিয়েন্ট মেরিনারের সেই অ্যালবাট্রস পাখির মতই সে আমাদের সৌভাগ্যের প্রতীক হয়ে ফিরে এসেছে।

মা অবশ্য খুশি হলেন না। তার এখনও ধারণা পীরের কথা অনুযায়ী তোতাটাই বদ জিনের সাগরেদ।

২২ জুলাই

নতুন বাড়িতে এসে উঠলাম। মইন ভাই নিজে এসে সব তদারকি করলেন। তিনি এবার ভোটে দাঁড়াবেন বলে শোনা যাচ্ছে। সরকার

পতনের সাথে সাথেই মইন ভাই দল বদলে পুরোনো ডেরায় ফিরে এসেছেন। তিনি আব্বাকে বললেন, চাচা নির্বাচনে দল ক্ষমতায় এলেই বাবুর নামে আমি আমাদের কলোনির নামকরণ করব। ওর কবরেও একটা স্মৃতিস্তম্ভ বানাবো বলে ঠিক করেছি।

নতুন বাড়িটা আকারে কলোনিরটার চেয়ে ছোট তবে আলো বাতাস প্রচুর। পেছনে খানিকটা উঠানমতো আছে। বাড়ির সামনে দুটো নারকেল গাছ। আমার পছন্দই হলো।

বিকেলে ফরহাদ ভাই এলেন। আমাদের নতুন বাসা থেকে তার বাসার দূরত্ব এখন খুবই কম। যখন খুশি তখন হেঁটেই চলে আসতে পারবেন। ভেবে ভালই লাগল। পরীক্ষার আর মাত্র হপ্তাখানেক বাকি। এ সময়ে তার সঙ্গটুকু খুব প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে।

২৩ জুলাই

আজ ডায়েরি লেখার চার মাস পুরো করলাম। সারাদিন ধরে পুরো ডায়েরিটা কয়েকবার পড়লাম। কত কত ঘটনা। মনে হলো আস্ত একটা উপন্যাস পড়ছি। কী বিচিত্র মানুষের জীবন। কত তার ওঠানামা, কত তার অহরহ রং বদল! মাত্র চার মাসেই যদি এত কিছু ঘটে তাহলে সারা জীবন একটা মানুষ কত কিছুই না প্রত্যক্ষ করে।

যদি ডায়েরি না লিখতাম তবে পরিচিত মানুষের টুকরো টুকরো ছবিগুলো এভাবে একটা ফ্রেমে ধরে রাখতে পারতাম না, জীবনকে কোনভাবেই এত নিবিড় করে কোনদিন দেখা হতো না। মেজদা

তোকে স্যালুট। কত কিছুই না তোর কাছ থেকে শিখেছি। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলেই তোকে দেয়া ওয়াদা পূরণ হবে। তুই চিন্তা করিস না মেজদা। তুই যখন পেরেছিস তখন আমিও অবশ্যই পারব। তোর স্বপ্ন আমি পূরণ করে ছাড়বোই।

ফরহাদ ভাই আজও আসতে দেরি করলেন। তার দেরিতে আবারও ছটফট ছটফট লাগছিল। মা'র চোখে ব্যাপারটা এড়ায়নি। তাকে পাশ কাটানোর জন্য আমি মাথাব্যথার বানোয়াট গল্প ফাঁদলাম। মা বিশ্বাস করল না, তা ঠিকই টের পেলাম।

ফরহাদ ভাই আসার পর ছটফট ভাবটা কমলো। তার সাথে তেমন কোন কথাবার্তা হলো না। সারাক্ষণ পড়ালেখার আলোচনাই চললো। অথচ তাকে অনেক কিছু বলবো ঠিক করে রেখেছিলাম। কয়েকবার প্রসঙ্গ তুলতে গিয়েও সামলে নিলাম। কেন এমন হচ্ছে?

রাতে শুয়ে শুয়ে অনেক্ষণ বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করলাম। ফরহাদ ভাইয়ের প্রতি দিন দিন আমার আকর্ষণ বেড়েই চলেছে। মাথার ভেতর লিমনের স্থানটা ক্রমশ সে দখল করে নিচ্ছে। চোখ বন্ধ করে কিছু একটা চিন্তা করতে গেলেই তার ছবি সমান্তরালে ভেসে ওঠে। খেয়াল করেছি তাকে নিয়ে নিজের ভেতর আগে যে বিদ্বেষ ছিল এখন তার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। বরঞ্চ ফরহাদ ভাই আমার পাশে নেই এটা ভাবতেই নিজেকে বড্ড একা মনে হয়। খুব অসহায় লাগে, কাঁদতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা, ফরহাদ ভাইও যদি লিমনের মত করেন? যদি আমাকে ফেলে চলে যান? এর বেশি চিন্তা করার আগেই চোখ ভিজে গেল। কেউ মানুক বা না মানুক আমি বলব, আলোর গতির চেয়েও

ভালোবাসার গতি বেশি। না হলে চরম অপছন্দের একটা মানুষকে কীভাবে আমি এত তাড়াতাড়ি এত ভালোবাসলাম!

২৫ জুলাই

পরীক্ষা যত কাছাচ্ছে, দিন ততো দ্রুত যাচ্ছে। নাক মুখ গুঁজে পড়ছি। ফরহাদ ভাই আসেন। এটা ওটা দেখিয়ে দেন। উৎসাহ দিতে তার জুড়ি মেলা ভার। তার কথা শুনলে মনে হয় আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক পা দিয়েই আছি; এখন কেবল ক্লাস শুরুর অপেক্ষা।

তপু পড়ালেখায় জোরেশোরে মন দিয়েছে। তারও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার ইচ্ছা। তার দেখাদেখি শুভ্রাও এসে বলল যে সে স্কুল ছেড়ে কালই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চায়!

আব্বার আগ্রহে প্রতিদিন মেজদার পছন্দের একটা খাবার রান্না করা হয়। আজ রাধা হয়েছিল লাউ পুঁটির ঝোল। আব্বা রোজকার মত খাবার নিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত জেগে থাকলেন। মেজদা এলো না। কোনদিনই সে আসে না। তারপরও আব্বা অগাধ বিশ্বাস নিয়ে বলেন, একদিন না একদিন বাবু আসবেই।

২৬ জুলাই

ট্রেনের টিকিট কেটে আনা হয়েছে। ২৮ তারিখ সকালে রওনা দেব। রাতে ফযলু কাকার বাসায় থাকব। ফজলু কাকা আব্বার মামাতো

ভাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছিই থাকেন। ২৯ তারিখে পরীক্ষা শেষে রাতের ট্রেনে ফিরে আসব।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল আব্বা সঙ্গে যাবেন। এর ভেতর যদি মেজদা এসে ফিরে যান এই ভেবে তিনি মত পাল্টালেন। তার বদলে ফরহাদ ভাই আর তপু যাবে। আব্বা না যাওয়ায় আমি বরং খুশিই হলাম। যেতে যেতে ফরহাদ ভাইয়ের সাথে অনেক গল্প করা যাবে।

আমার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে শুনে তপুর সে কী উল্লাস! ওর ভাব দেখে মনে হল আমি না ও নিজেই ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। আমরা দুজন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি শুনে শুভ্রার মন খারাপ হয়ে গেল। সে সারাদিন কান্নাকাটি করে চোখ ফুলিয়ে এক শেষ। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার জন্য কার্টুনের অনেক বই এনে দেয়া হবে এই কথা দিয়ে তাকে কোন মতে শান্ত করা গেল।

ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাব ভেবে নিজের খুব উত্তেজনা হচ্ছে। ভয়ও লাগছে কিছুটা। যদি প্রশ্ন কমন না আসে? যদি রোল নম্বর ভুল লিখি! দুর ছাই এসব কী আবোল তাবোল ভাবছি! অবশ্যই আমার পরীক্ষা ভাল হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ভর্তি হবোই ইনশাল্লাহ।

২৭ জুলাই

ব্যস্ত দিন কাটলো। পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র গোছগাছ করলাম। শেষদিকে পড়ায় আর মন বসছিল না। তাই ফরহাদ ভাইসহ আমরা চারজনে মিলে কিছুক্ষণ ক্যারাম খেললাম ।

ওহ্, বড় ভাইয়ার চিঠি এসেছে। ভাইয়া আগামী মাসেই দেশে আসছে। লিখেছে, ও এলে সবাইকে নিয়ে কক্সবাজার বেড়াতে যাবে। সমুদ্র দেখা যাবে, এই ভেবে সবাই শিহরিত হলাম। আব্বা তো নিশ্চিত কক্সবাজারে গেলেই মেজদার সাথে দেখা হবে, হাঁটতে হাঁটতে সে তো সমুদ্রের কাছেই যাবে বলেছে।

তোতাটা আপুনি বলতে শিখেছে। আমাকে আজ বারবার আপুনি বলে ডাকল। ওর খাঁচা এখন খোলাই থাকে। ও বাইরে যায়, ঘুরে ফিরে আবার খাঁচায় ফিরে আসে। ভালোবাসা কী অদৃশ্য মায়াবোনা সুতো! নইলে খোলা আকাশের স্বাধীনতা ফেলে কেউ কি খাঁচার পরাধীনতা মেনে নেয়?

২৮ জুলাই

রাতে ঠিকমত ঘুম হয়নি। বারবার ঘুম ভেঙে মনে হয়েছে এই বুঝি ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। ভোর না হতেই ঘুম থেকে উঠে গেলাম। ঘণ্টা দুই বাদেই ট্রেন। কাল খুব গরম পড়েছিল। আজ আকাশে মেঘ। বাতাসে শীত শীত একটা ভাব। মনে হয় বৃষ্টি হবে। উঠোনে দাঁড়াতেই চোখে একফোঁটা জল এসে পড়ল। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলাম। দুদিনের জন্য যাচ্ছি। এ দুদিন ডায়েরিতে কিছু লেখা হবে না।

ভাবতেই মন খারাপ হচ্ছে। ডায়েরিরও কি একই অনুভূতি হচ্ছে? ওকে কি কিছু লেখা উচিত? মন বলছে উচিত।

প্রিয় ডায়েরি,

দুদিনের জন্য তোমার কাছ থেকে ছুটি নিচ্ছি। কিছু মনে কর না। তুমি আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তোমাকে রেখে যেতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কী করব বল। দূরের জার্নিতে যাচ্ছি। পথে যদি তোমাকে হারিয়ে ফেলি! তার চেয়ে তুমি বাসাতেই থাক। ভয় পেয়ো না। কেউ তোমাকে ধরবে না। তোমাকে গোপন কোথাও লুকিয়ে রেখে যাব। বন্ধু আমার, মাত্র দুদিন তারপরেই আবার আমাদের দেখা হবে। তোমার জন্য অনেক গল্প জমিয়ে আনবো দেখ। তুমি রাগ করো না প্লিজ। তুমি ছাড়া আমার এত কাছের আর কে আছে বল! তুমিই ধরে রেখেছ আমার সমস্ত অনুভূতি, আনন্দ, অশ্রু। যেদিন থেকে তোমার সাথে গল্প শুরু করেছি সেদিন থেকেই নিজেকে একা বলে ভাবতে পারি না। যতদিন আমি থাকব ততদিন তুমি আমার সাথে থাকবে, বিশ্বাস কর বন্ধু, কথা দিচ্ছি তোমার সাথে আমার গল্পের কোন শেষ হবে না। মাত্র চার মাসে যতটুকু আপন তুমি হয়েছ তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ পোক্ত হবে আমাদের বন্ধুত্ব। মাত্র দুদিন বন্ধু। ভাল থেক। ভুলেও আমাকে ভুলো না।

ইতি
তোমার একমাত্র বন্ধু

১০ বছর পর

সামনের নারকেল গাছ দুটোর একটা বাজ পড়ে ন্যাড়া হয়ে গেছে। বাড়ির এখানে ওখানে আগাছা মত ঘাস জন্মেছে। উঠোনের ফুলগুলোতেও অযত্নের ছাপ। টিনের চালে জং ধরেছে, হাজার বছরের পুরোনো দেখায়। এছাড়া বাসাটা অবিকল আগের মতই আছে।

বাড়িতে খাঁচার সংখ্যা আরেকটা বেড়েছে। পুরোনো তোতাটা আরেকটা তোতাকে যোগাড় করে এনেছিল। ওদের ছানাপোনারা এখন সেখানে থাকে। ওরা কিচিরমিচির করে বাড়িটাকে মুখর করে রাখে।

বারন্দায় আব্বা এখনো বসে থাকেন। দ্বিতীয়বার স্ট্রোকের পর তার জন্য একটা ইজিচেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পান না। তারপরও মেজদার জন্য তার রাতজাগা চাই। আম্মাও বুড়িয়ে গেছেন। লাঠি ছাড়া চলাফেরা করতে পারেন না।

বড় ভাইয়া, ভাবিও এখন এখানে থাকেন। ভাইয়া দেশে এসে আর ফিরে যাননি। এটা ওটা করতে যেয়ে টাকাপয়সা সব খুইয়েছেন। আব্বার পেনশনের টাকায় মার্কেটে একটা দোকান নেয়া হয়েছিল। ভাইয়া ওটার দেখাশোনা করেন। অনি দেখতে ঠিক মেজদার মত হয়েছে। চাল চলনও সেরকম। ওর আরেকটা ভাই হয়েছে, নাম অন্ত।

শুভ্রা অনেক বড় হয়ে গেছে। সামনে এসএসসি দেবে।

কিছুদিন হলো পেয়ারু মামা গত হয়েছেন। কচা এক বাচ্চার বাপ। ছোট পীর সাহেব নীমতলির বর্তমান পীর। দেশের নামকরা পীর তিনি। গণ্যমান্য অনেক লোক তার একনিষ্ঠ মুরিদ।

তমা আপুর সাথে তমিজ ভাইয়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। দুজনেই আবার বিয়ে করেছেন। বাচ্চাটা অবশ্য তমা আপুর কাছেই থাকে।

ভুল চিকিৎসায় রোগী মরে যাওয়ায় ছোট ফুপার নামে মার্ডার কেস হয়েছিল। আট বছর ধরে কেস চালাতে গিয়ে তারা প্রায় ফতুর। ছেলেমেয়েরা ওনাদের দুজনকেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করে বিদেশ চলে গিয়েছে।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এই ভাল তো এই খারাপ। নেতারা সবাই ক্ষমতা নিয়ে কামড়াকামড়িতে ব্যস্ত। মাঝখানে হরতাল অবরোধে জনগণের নাভিশ্বাস। মেজদারা যে সরকার হটাতে প্রাণ দিয়েছিল জনগণ তাদেরকেই আবার ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছে। চারিদিকে চলছে বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া। আব্বাদের কারখানা অনেক আগেই লোকসানের অজুহাতে লে অফ করে দেয়া হয়েছিল। এখন সেটি ভেঙ্গে বেসরকারি উদ্যোগে আবাসিক প্রকল্প চালু করা হয়েছে। সেই প্রকল্পের আওতায় কলোনিটিকেও ভেঙ্গেচুরে নতুন রূপ দেয়া হয়েছে।

মইন ভাই এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী। নিন্দুকেরা তাকে "ডিগবাজি মইন" ডাকলেও তিনি আব্বাকে দেয়া তার কথা রেখেছেন। কলোনি এলাকাটার নতুন নাম হয়েছে শহীদ বাবু নগর আবাসিক প্রকল্প। লাখ

টাকা দামে সেখানে ফ্লাট বিক্রি হচ্ছে। বেশ ঘটা করে তিনি সেই প্রকল্পের ফলক উন্মোচন করেছেন।

মেজদার কবর সেই আগের মতই আছে। শুধু কবর সংস্কারের নামে হিজল গাছটা কেটে সেখানে একটা স্মৃতি মিনার বানানো হয়েছে। শহীদ বাবু স্মৃতি সংসদের নামে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে কে বা কারা কবরের আশেপাশের খাস জমিও দখল করে নিয়েছে। দখলবাজদের কবলে পড়ে রাজেশ্বরী নদী আর নদী নেই, খাল হয়ে গিয়েছে। নদীর মাঝখানে মাঝখানে গড়ে উঠেছে ঘরবাড়ি, কল মিল।

আপুনি আগের মতই আছে। ভর্তি পরীক্ষায় টিকেও আপুনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারেনি। পরীক্ষা শেষে ফেরার পথে দুটি ছাত্র সংগঠনের ভেতর চলা গোলাগুলির মাঝখানে পড়ে ফরহাদ ভাই মারা যান। চোখের সামনে ফরহাদ ভাইকে মারা যেতে দেখে আপুনি প্রচণ্ড শকড হয়। সেই থেকে সে নির্বাক, স্মৃতিহীন। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছেন হয়তো একদিন আপুনি আপনাতেই ভালো হয়ে যাবে নয়তো সারাজীবন সে এমনই থাকবে।

গত দশটা বছর ধরে আমার প্রিয় আপুনি কোন কথা বলে না, কাউকে চিনতে পারে না, শুধুই শূন্য দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। লিমন ভাই বিদেশ থেকে বড় ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এসেছেন। তিন চারদিন পরপর তিনি আপুনিকে দেখতে আসেন। কথা বলেন না। আপুনির হাত ধরে চুপচাপ সময় কাটিয়ে চলে যান।

ছুটিতে বাড়ি গেলে আমিও আপুনির পাশে বসে থাকি। অনেক কথা বলি। আপুনি কোন উত্তর দেয় না। আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন প্রায় শেষ। ভাবছি পরীক্ষার পর আপুনিকে নিয়ে সমুদ্র দেখতে যাব। কে জানে সমুদ্রের কাছে গেলেই আপুনি হয়ত বলে উঠবে, তপু বলেছিলাম না আমরা একদিন সমুদ্রে যাবোই। সে দিনটির কথা ভাবলেই আনন্দ হয়, জলে চোখ কিংবদন্তির রাজেশ্বরী হয়ে ওঠে।